ব্যক্তিগত

– অনিকা রহমান তুলি

চার অক্ষরের একটি শব্দ ভালোবাসা। কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক ও বিস্তৃত। আজ আমাদের পরিবেশ ভরে গেছে নোংরামি ও ঘৃণায়। তবুও আমরা টিকে আছি। কারণ আজও কোথাও না কোথাও আমাদের অন্তরালে বিরাজ করছে অপরিসীম ভালোবাসা। এ ভালোবাসাই মানুষকে করেছে মহান। মানুষ তাই ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াই করে আজও টিকে আছে।

ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কষ্ট হয় যখন দেখি ভালোবাসার নামে মানুষ লোভ–লালসায় মত্ত হয়ে তার পশুত্বকে ফুটিয়ে তুলছে। আমি একজন নারী। তাই সব সময় ভাবতাম ছেলেরা পশুর মতোই তাদের শরীরটাকে ব্যবহার করে। তাদের কাছে নারীর মানেই ভোগ্যবস্তু। ভালোবাসার 'ভ' সম্বন্ধেও তারা জানে না। কালে কালে আমার এ ভুল ধারণা ভাঙলো। কিছু ঘটনা আমার মনকে নতুন করে জাগিয়ে তুললো। দেখলাম ও বুঝলাম সব ছেলেরা এবং সব মেয়েরা এক রকম হয় না। একজন ছেলে চরিত্রহীন ও একজন মেয়ে চরিত্রবতী হয় এ কথাটা ঠিক না। যার মধ্যে সংস্কার ও মনুষ্যত্ব আছে, কেবল তিনিই হন চরিত্রবান বা চরিত্রবতী।

আমার এ লেখা কাউকে কটাক্ষ করার জন্য নয়। ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা মাত্র। আমার মতে, ভালোবাসা অতি পবিত্র যা দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা যায়। তাই তো বাবার ভালোবাসার কাছে মৃত্যুকেও পরাজিত হতে হয়েছিল।

ভালোবাসা আল্লাহর সৃষ্টি। তাই হয়তো বা সে পৃথিবীর প্রথম মানবের সঙ্গী করে পাঠিয়েছিল এক মানবীকে। কিন্তু আজকালের ভালোবাসার রঙ যেন একটু বদলে গিয়েছে। এখন আর আমাদের ভালোবাসার মাঝে শুভ্রতা বা পবিত্রতা নেই। একেবারেই যে নেই তা নয়। আছে, তবে কম। তাই বলে ভালোবাসার অর্থ পাল্টায়নি। ভালোবাসা তার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আছে আগের জায়গাতেই। বদলে গেছি আমরা এবং আমাদের মানসিকতা।

ভালোবাসা হচ্ছে একটি স্বপ্ন যা মানুষকে সামনের দিকে যেতে শেখায়। মানুষকে সাহায্য করে সৃষ্টিশীল কাজে। ভালোবাসা হবে সুন্দর, শুভ্র ও নির্মল। ভালোবাসার মাঝে থাকবে শুদ্ধতা, সরলতা ও বিশ্বস্ততা।

কিন্তু কতোজন নরনারী পেরেছেন নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে তার ভালোবাসার মানুষটির কাছে প্রকাশ করতে? মন এবং শরীর একে অপরের থেকে আলাদা নয়। একজন মানুষকে মন থেকে ভালোবাসলে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হতে পারে এটা স্বাভাবিক। ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোনো এক দুর্বল মুহূর্ত আসতেও পারে। এটা দোষের কিছু না। তবে এটা অবশ্যই পাপ যখন ভালোবাসা মনকে না ছুয়ে কেবল শরীরকে স্পর্শ করে কিংবা ভালোবাসা মনকে যতো না স্পর্শ করে তার চেয়ে অনেক বেশি শরীরকে স্পর্শ করে।

ভালোবাসার প্রথম পর্যায়ে একজন অপরজন সম্বন্ধে জানে, বোঝে ও নিজেকে প্রকাশ করে তার কাছে। অনেক সময় দেখা যায়, তারা পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারছে না। কেননা তারা একে অপরকে প্রচণ্ড অনুভব করছে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, একে অপরের কাছে আসার একটিই কারণ। তা হচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের শরীরের প্রতি আকর্ষণ। তাহলে এটি কি কারো প্রতি ভালোবাসা হলো? শরীর ও মন যেমন একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ঠিক তেমনি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। যাকে ভালোবাসি তাকে আগে শ্রদ্ধা করা উচিত। শ্রদ্ধা পূর্ণ ভালোবাসাই আমাদেরকে দিতে পারে একটি রুচিপূর্ণ সম্পর্ক।

প্রায়ই দেখা যায়, একজন পুরুষ ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। অথচ তার স্ত্রী, সন্তান ও সুন্দর সংসার আছে। তবে তার সন্তান কি স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার পরিণাম, নাকি কেবল শারীরিক ক্ষিধে

মেটানোর ফসল? বিয়ে করলেই ভালোবাসার বৈধতা মিলে না। ভালোবাসতে হয় মনের গহীন থেকে যেখানে ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা বিরাজ করে।

আবার প্রায়ই দেখা যায়, একজন নারী কারো স্ত্রী, কারো মা। কিন্তু সেও অন্য পুরুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং হয়তো বা সফলও হয়েছে। এতে একজন নারী যেমন তার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব হারাচ্ছে ঠিক তেমনি একজন নারীর কারণে একজন পুরুষের চরিত্রেও দাগ পড়ছে। এ সমাজে এমন অনেক দম্পতি আছে যাদের ওপরে সভ্যতার পোশাক, অথচ ভেতরে মনটাকে অসভ্য জাতির মতো উদাম করে চলছে।

একজন নারী বা পুরুষ যখন অন্যায় করে তখন সবার কাছ থেকে লুকায় পাছে তাকে কেউ সম্মান করবে না। কিন্তু তাদের বিবেক কি একবারও কাজ করে না? তাদের অন্যায় দিয়ে তাদের বিবেক কি একবারও দংশিত হয় না? মানুষ হিসেবে সবাই চায় অন্যের কাছে থেকে শ্রদ্ধা পেতে। কিন্তু নিজের প্রতি সম্মান বোধ?

ভদ্রতার মুখোশ পরে নাহয় সবার কাছে থেকে শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের প্রতি নিজের কি বিন্দু পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ থাকে? তাছাড়া সবাইকে ফাকি দিয়ে না হয় পারা যায়। তবে সৃষ্টিকর্তাকে কি ফাকি দেয়া যায়?

একজন মানুষ যখন এটা চিন্তা করে চলেন যে, তিনি কারো বাবা বা মা, ভাই বা বোন, সন্তান এবং সর্বোপরি একজন মানুষ তখন সে সকল পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে। আমারই অশ্লীলতায় ধ্বংস হতে পারি আমি, আমার পরিবার এবং আমার সমাজ। তাই সকল মুহূর্তে বিবেককে কাজে লাগিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত উচিত।

ভালোবাসা আমাদেরকে ত্যাগ করতে শেখায়। নিজে কষ্ট পেয়ে অন্যকে সুখী করতে শেখায়। ভালোবাসা হবে নির্ভেজাল যেখানে নিজেকে ষোল আনা প্রকাশ করা যাবে অন্যের কাছে। যেখানে নিজের কর্মের জন্য আত্মগ্লানির বোঝা বইতে হবে না। ভালোবাসা হবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। ভালোবাসা কখনো বা হবে একটি বিশেষ মানুষের প্রতি। তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু ভালোভাবে বিবেচনা করুন এটা কি ভালোবাসা, না মোহ?

ভালোবাসুন মন উজাড় করে। ভালোবাসার মানুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে একটি বিশুদ্ধ ভালোবাসার জন্ম দিন। সেই ভালোবাসা মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগাবে। সেই ভালোবাসার পবিত্রতা আমাদেরকে নিয়ে যাবে অনেক দূরের স্বপ্নরাজ্যে, যে রাজ্যে সুখ আছে, শান্তি আছে।

একটি শুদ্ধ ভালোবাসার সম্পর্কই দিতে পারে অন্ধকার ঘরে আলো, নিরাশার মাঝে আশা আর ব্যর্থতার মাঝে আত্মবিশ্বাস। মনে রাখবেন, ভালোবাসার অপর নাম বিশ্বাস, ধোকা নয়।

গেন্ডারিয়া, ঢাকা থেকে

সোলমেট

– অমিত আহসান

২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩। বিবিএ-র একটা প্রজেক্টের ব্যাপারে আলোচনার জন্য টুম্পা অপেক্ষা করছিল *সুপ্রম রিসোর্সেস লিমিটেড-এর* কর্পরেট হেড অফিসের রিসেপশন এরিয়ায়। পাচ মিনিটের কথা বলে রিসেপশনিস্ট তাকে আধঘণ্টারও বেশি সময় বসিয়ে রেখেছে।

এমন তো কথা ছিল না। গতকাল ফোনে ভদ্রলোককে বেশ ওয়েলকামিং মনে হয়েছে। তার প্রজেক্টের কথা শুনে আগ্রহের সঙ্গেই এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিল। এখন অভদ্রের মতো বসিয়ে রেখেছে, টুম্পা ভাবছিল। একদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল বাড়ি ফেরা আরেক ঝক্কি।

খানিকটা হতাশ হয়ে টুম্পা চলে যাবে ভাবতেই রিসেপশনিস্ট এগিয়ে এসে বললো, আপা আসুন, স্যার ফ্রি হয়েছেন।

ভদ্রলোকের নাম আনিস আহমেদ। তিনি এই কম্পানির একসিকিউটিভ ডিরেক্টর। টুম্পা ঘরে ঢুকতেই তিনি করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। দেশের বাইরের একটা জরুরি কল ছিল। বলো কি খাবে? চা, কফি না সোডা? আমি তোমাকে তুমি করেই বললাম, কিছু মনে করলে না তো?

না, না, আপনি আমার অনেক সিনিয়র। আমাকে অবশ্যই তুমি করে বলতে পারেন। আর আমি আজ কিছু খাবো না। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। আপনাকে গতকাল ফোনে যে পয়েন্টগুলো বলেছিলাম সেগুলো এখানে লিখে এনেছি।

টুম্পা ওর সঙ্গে আনা কাগজটা এগিয়ে দেয় আর বলে, আপনি যদি কাইন্ডলি আমাকে একটু হেলপ করেন তাহলে আই উড বি গ্রেটফুল ফরএভার।

বাহ! তুমি তো বেশ সুন্দর করে কথা বলো। অ্যাজ প্রমিজড, আই উইল হেলপ ইউ থ্রুআউট দি প্রজেক্ট। একজন আইবিএ অ্যালামনাই হিসেবে এটা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এর জন্য তোমাকে *ফরএভার* কৃতজ্ঞ হতে হবে না। আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খেলেই চলবে।

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনটা বেশ ভালোই লাগে টুম্পার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, তার উপর বাসে চেপে ফিরতে হবে উত্তরায়। কিন্তু ঠেকাটা নিজের বলে টুম্পা সায় দেয়, ঠিক আছে। তবে চা, কফি না।

ইন্টারকম-এ দুকাপ চায়ের কথা বলে আনিস টুম্পার প্রজেক্ট নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলো।

সিরিয়াস টুম্পা এ সুযোগ হাতছাড়া করলো না। আলোচনাটা জমে উঠলে সে আর ঘড়ির দিকে তাকায় না।

এভাবে ঘণ্টা দুয়েক পেরিয়ে গেলে আনিসই এক সময় বলেন, আজ এ পর্যন্তই। তুমি আবার একদিন এসো ফর ফার্দার ডিসকাশন।

থ্যাংক ইউ। আমাকে এখন উত্তরা যেতে হবে বাসে চেপে আর তাই একটু তাড়া করছিলাম। টুম্পা উঠে দাড়ায়।

তুমি উত্তরা থেকে বাসে যাতায়াত করো! দেশের যা অবস্থা, বাবা-মা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় থাকেন?

তা তো থাকেনই। কি আর করা! আমার মতো আরো অনেকেই এভাবে যাতায়াত করে।

তুমি আমার মোবাইল ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। বাড়ি পৌছে একটা খবর দিও।

বাসে বাসে টুম্পা ভাবছিল, আনিস আহমেদ লোকটা আসলেই একটা ভদ্রলোক। তার শেষ কথাটায় আন্তরিকতা ছিল। বাড়াবাড়ি হলেও মেকি মনে হয়নি। লোকটা নিশ্চয়ই ম্যারেড। আর বৌটা সেক্ষেত্রে খুবই লাকি। আমার ভাগ্যে কি এ রকম একটা জামাই জুটবে? এসব উল্টা-পাল্টা ভেবে টুম্পা নিজেই লজ্জা পায় এবং মনে মনে হাসে।

১০ অক্টোবর ২০০৩। শুক্রবার দিনটা টুম্পা একটু দেরি করেই ওঠে ঘুম থেকে। কেউ তাকে ডাকে না। আজ মা ডেকে তুললেন। এই তোর ফোন।

চোখে ঘুম নিয়েই টুম্পা ফোন ধরে, হ্যালো, কে বলছেন?

আমি আনিস। আনিস আহমেদ ফ্রম সুপ্রিম রিসোর্সেস।

জি, আসসালামু আলাইকুম।

তোমাকে কি ঘুম থেকে ওঠালাম?

ঠিক আছে। ছুটির দিনে একটু দেরিতেই উঠি। কি ব্যাপার বলুন তো?

পেপারে একটা ব্যাড নিউজ পড়ে তোমার কথা মনে এলো। সেদিন বাড়ি পৌছে আমাকে ফোন দিতে ভুলে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই।

আই অ্যাম রিয়লি সরি। এতো ক্লান্ত ছিলাম যে, এসেই শুয়ে পড়েছিলাম। আমার ফোন নাম্বার কোথায় পেলেন?

তোমার সিভিতে ছিল। এখন বলো তোমার কাজ কতোদূর এগোলো?

অনেকটাই। আরেকবার আসতে হবে আপনার ওখানে।

ফোন করে চলে এসো, ডোন্ট হেসিটেট। রাখি তাহলে।

ভালো থাকবেন।

সেম টু ইউ।

ফোন নামিয়ে রেখে আনিস ভাবছিল টুম্পার কথা। মেয়েটি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড ব্রাইট। ইন্টেলিজেনস ছাড়াও ওর মধ্যে একটা আবেদন আছে। আনিস কেমন যেন একটা আকর্ষণ বোধ করে যা কি না ওর ম্যারেড লাইফে আগে কখনোই হয়নি।

টুম্পা সেদিন অনেকটা সময় নিয়ে শাওয়ার নিচ্ছিল। এই সময়টাই ওর একান্ত ব্যক্তিগত সময়। জীবনের বেশির ভাগ চিন্তা–ভাবনা আর প্ল্যান–প্রোগ্রামগুলো বোধহয় সে শাওয়ারের নিচেই নিয়েছে।

তার প্রথম প্রেম রাফির সঙ্গে ডেট করার আগের ফ্যান্টাসিগুলো কিংবা পরের রিক্যাপগুলো সবই হয়েছিল শাওয়ারের নিচে। বয়ঃসন্ধির দুষ্টুমিগুলোও। আজ ভাবছে, আনিস লোকটার সঙ্গে একটু প্রেম করলে কেমন হয়!

১৫ অক্টোবর ২০০৩। কোনো রকম এপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই টুম্পা ডু দিল আনিসের অফিসে। রিসেপশনিস্টকে ফাকি দিয়ে সোজা ওর ঘরে।

আসতে পারি?

আরে, টুম্পা। হোয়াট এ সারপ্রাইজ!

এদিক দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। ভাবলাম দেখি আপনাকে পাই কি না। কিছু মনে করেননি তো?

আরে না, না। আমার তো মনে হচ্ছে, গড হিমসেলফ হ্যাজ সেন্ট ইউ। যাকে বলে গডসেন্ট।

মানে?

মানেটা আরেক সময় বলবো। আমার মনটা আজ ভালো নেই। বাহ্যত এই বর্ণাঢ্য জীবনে কিছু একান্ত কষ্ট আছে যা কি না কারো সঙ্গে শেয়ার করাও যায় না আবার শেয়ার না করা পর্যন্ত এই একাকীত্বের যন্ত্রণা অসহ্য লাগে। তুমি এসে ভালোই করেছো।

আনিসকে আজ একদম অন্য রকম লাগে টুম্পার। সে বুঝে উঠতে পারে না কি বলবে!

এই সময় আনিসই বলে, সরি, তোমাকে বোধহয় একটু বিব্রতই করলাম। হয়তো ভাবছো, এ লোকটার হয়েছে কি! একজন অপরিচিতার কাছে...।

না, আপনি বলুন।

আসলে কি জানো, তোমাকে কেন যেন আমার অপরিচিত মনে হয় না। যাকগে, আজ একদম কাজে মন বসছে না। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌছে দিই যদি আপত্তি না থাকে। পথেই নাহয় তোমার প্রজেক্টের কথা শুনবো। আনিস উঠে দাড়ান।

চলুন।

গাড়িতে উঠে আনিসই আবার শুরু করেন।

আমার মন খারাপের কারণ তোমার না জানলেও চলবে। তুমি বরং তোমার কথা বলো। কি করবে বিবিএ শেষ করে?

সোজা চাকরিতে ঢুকবো। আমার রেজাল্ট এ পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই হচ্ছে। মালটিন্যাশনালে ঢোকার ইচ্ছা।

গুড। তবে সেই সঙ্গে এমবিএ করে নিও।
ইভনিংয়ে চেষ্টা করবো। আম্মা তো পারলে কালই বিয়ে দিয়ে দেন। আমার পর পর দুটো এফেয়ার ব্রেকআপের পর ঠিক করেছি, আর ও রাস্তায় নয়।
সরি টু হিয়ার দ্যাট।
সরি হবার কিছু নেই। আজকালকার পোলাপানদের মেন্টালিটি আমার পছন্দ হয় না। ইমম্যাচিওরড।
হাও ওলড আর ইউ?
আই অ্যাম টোয়েন্টি থ্। মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি, জানেন তো?
তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আনিস রসিকতা করেন।
এ রকম হালকা আলাপচারিতার মাঝে আনিসের গাড়ি উত্তরার কাছাকাছি এসে পড়ে।
তোমাকে কোথায় নামাতে হবে, আনিস জানতে চান।
আমার হাতে এখনো কিছু সময় আছে।
তা হলে চলো এক টান দিয়ে আশুলিয়ায় চটপটি খেয়ে আসি।
আশুলিয়া পর্যন্ত যেতে পারি। তবে গাড়ি থেকে নেমে কিছু খাবো না। কেউ দেখে ফেললে আমি মহা বিপদে পড়বো।
সেটা ঠিকই বলেছো। চলো শুধু ঘুরেই আসি। কি গান শুনবে বলো। বলে আনিস টুম্পাকে সিডির বক্সটা দেখিয়ে দেন।
আপনার দেখি শুধু বাংলা কালেকশন।
আমি খুব একটা গানের সমঝদার নই। যা শুনি, বাংলাই শুনি।
আপনাকে খুব সিলেক্টেড কিছু ইংরেজি গান শোনাবো। একাকীত্বের সময়ে সঙ্গ দিতে যেগুলোর জুড়ি নেই।
টুম্পাকে নামিয়ে দেয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসেন তিনি।
আপনাকে একটা হাগ দিতে পারি? প্রশ্নটা করে টুম্পা উত্তরের অপেক্ষা না করেই আনিসকে হাগ করে।
আনিস হতচকিয়ে যায় আর ভাবেন এটা কি হচ্ছে। এরপর টুম্পা গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া পর্যন্ত কেউ আর কোনো কথা বলে না।
রাইডটা বেশ ভালোই লাগলো আনিসের। যদিও অসম বয়সের এই রিলেশনশিপটা তিনি ঠিক ডিফাইন করতে পারেন না।
বাড়ি ফিরেও আনিস আজকের অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এ রকম একটা সম্পর্ক থাকলে মন্দ কি! গুমোট বদ্ধ ঘরে একটা খোলা জানালার মতো। কিন্তু মেয়েটি সেটা কিভাবে নেবে। সে যদি আবার প্রেমে পড়ে যায়, তখন কষ্ট পাবে। এটা ঠিক হবে না। তাহলে? নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলেন আনিস।
আনিস পরদিন সকালে অফিসে গিয়েই টুম্পাকে একটা ই-মেইল করেন। তুমি আমার সোলমেট হবে?
বিকেলেই ই-মেইলের জবাবে ফোন এলো। সোলমেট ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। গতকাল আমার কৃতকর্মের জন্য আমি লজ্জিত। আচ্ছা বলুন তো, অপোজিট সেক্সের মধ্যে কি কখনো বন্ধুত্ব হয়?
হবে না কেন?
না, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, হয় না। ইট গেটস ইনটু ফিজিকাল থিং।
তোমার কথাও ঠিক। আসলে সত্যিকার বন্ধুত্ব ইজ অল এবাউট গিভিং। এবং সে কারণেই হয় তো কখনো কখনো অপোজিট সেক্সের মধ্যে দেয়া-নেয়াটা একটু বেশি হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে কোনো পক্ষই সেটাকে অনৈতিক কিংবা পাপ মনে করে না।

আপনি আমাকে বাচালেন। একটা সম্পর্ক নিয়ে খুব অপরাধ বোধে ভুগছিলাম। ঘটনাগুলো ঘটার সময় একটুও অনৈতিক মনে হয়নি। কিন্তু পরে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছে। কারণ, ভদ্রলোক ম্যারেড ছিলেন। আমি ইন ফ্যাক্ট, এরপর থেকে অনেকটা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

টুম্পার কথা শুনে আনিস ভাবেন, শি নিডস হেলপ।

এসব নিয়ে এতো ভেবো না তো টুম্পা। তোমার এখন সেটলড হওয়ার সময়। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার সময়। নিজের ভবিষ্যৎ আর ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে ফাইন্ড আউট এ লাইফ পার্টনার। আমাকে বললে আমিও খুজে দেখতে পারি। আনিস টুম্পাকে একটু চিয়ার-আপ করতে চান।

তোমার বয়স বছর দশেক কম হলে এই খোজাখুজিটা আর লাগতো না।

টুম্পার *তুমি* সম্বোধন আর এই অদ্ভুত জবাবে আনিস কি বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। ব্যাপারটা হালকা করার জন্য তিনি বলেন, তুমি জানো না যে, *মেন অ্যান্ড লিকিওর ইম্প্রুভ উইথ এজ!*

আজ রাখি। আমার ভালো লাগছে না। ইচ্ছে হলে পরে ফোন করো। টুম্পা হঠাৎ করেই ফোন রেখে দেয়।

১৮ অক্টোবর ২০০৩। আনিসের অফিসে টুম্পা এসে হাজির। হাতে একটা অডিও সিডি। আনিসের দিকে সিডিটা এগিয়ে দিয়ে সে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, এক কাপ কফি খাওয়াও আর এটা রাখো, এখানে আমার প্রিয় কিছু গান আছে। সময় পেলে শুনো।

আনিস বুঝতে পারেন যে, মেয়েটি খুব অস্থির হয়ে আছে। তাই তাকে ডেলিকেটলি হ্যান্ডল করতে হবে।

ইন্টারকমে কফি-র কথা বলে আনিস জিজ্ঞাসা করেন, সোলমেটের-এ ব্যাপারটা ভেবেছো?

আমি একই ভুল আবার করতে চাই না।

আমি সাহায্য করবো। সোলমেট অবশ্যই বন্ধুত্ব। তবে সেটা আত্মার বন্ধুত্ব। এ বন্ধুত্বে স্বাভাবিকভাবেই ভালোবাসা থাকবে কিন্তু সেটা প্রেম নয়। পারবে?

আমাকে পারতেই হবে। আই নিড সামওয়ান লাইক ইউ, আনিস। আজ থেকে তুমিই আমার সোলমেট। কথাটা বলেই টুম্পা হ্যান্ডশেক করার ভঙ্গিতে আনিসের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

আনিস ওর হাতটা টেনে নিয়ে কপালে আলতো করে একটা চুমু দিয়ে বলেন, আই উইল অলওয়েজ বি দেয়ার ফর ইউ, সোলমেট।

এরপর আনিস আর টুম্পার মধ্যে প্রায়ই টেলিফোনে কথা হয়। চালাচালি হয় ই-মেইল। প্রাণ খুলে ওরা শেয়ার করে মাথায় যখন যা আসে। সম্পর্কটা জমে উঠে দুটি অসম বয়সের মানুষের মধ্যে কিন্তু দায়িত্ব বোধের কারণেই আনিস কখনোই সেটা কোনোভাবেই জটিল হতে দেন না।

১১ ডিসেম্বর ২০০৩। টুম্পার ফোনে নালিশের সুর। কি ব্যাপার, দুটো মেইল দিলাম। কোনো খবর নেই!

নতুন প্রজেক্ট নিয়ে খুব ঝামেলার মধ্যে আছি। ফোন করে ভালোই করেছো। কাল সপ্তাহ দুয়েকের জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছি। তোমার জন্য কি আনবো বলো।

আমার জন্য কিছু আনতে হবে না। তোমার বৌয়ের জন্য এনো। আমার জন্য একটু দোয়া করলেই চলবে। কারণ, আমার দুটো ইন্টারভিউ আছে সামনে।

নিশ্চয়ই দোয়া করবো আর ফিরে এসেই যোগাযোগ করবো। গুড লাক।

২৭ ডিসেম্বর ২০০৩। জার্মানি থেকে ফিরে এসেই আনিস ফোন দিলেন টুম্পাকে। কি খবর বন্ধু? ইন্টারভিউ কেমন হলো?

বিএটি-র টা ভালো হয়নি। তবে এমেক্স-এরটা ভালো হয়েছে। সামনের মাস থেকে ইন্টারনিশিপ শুরু। এর চেয়েও ভালো একটা খবর আছে। তবে ফোনে নয়, তোমার অফিসে এসে দেবো।

আজই চলে এসো।

না, আজ নয়। কালকে লাঞ্চের পর তোমার সময় হবে?

তোমার জন্য সময় বের করে নেবো। চলে এসো।

২৮ ডিসেম্বর ২০০৩। টুম্পা আজ শাড়ি পরে এসেছে। দারুণ মিষ্টি লাগছে ওকে দেখতে।

আচ্ছা, ব্যাপার কি বলো তো, টুম্পা। ইউ আর লুকিং সো সেক্সি টুডে! আনিস টিজ করেন।

গেস হোয়াট?

গেস–টেস করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি বলো।

আগামী জুনে আমার বিয়ে।

আনিস আচমকা খবরটি পেয়ে খুশি হলো কি হলেন না, নিজেই তা বুঝতে পারেন না।

সে কি, আমি কয়েকদিন ছিলাম না আর এর মধ্যেই এতো বড় ষড়যন্ত্র! ডিটেইল বলো। আমার এই রাইভালটা কে? কি করে? কোথায় পেলে তাকে?

বলছি, বলছি। এমেক্সে কাজ করে। ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে এমবিএ করেছে। আমার ইন্টার্নশিপ ইন্টারভিউর সময় পরিচয়। এরপর কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে। একদিন সরাসরি প্রপোজ করলো। দেখা করলাম। আম্মার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। তিনি পছন্দ করেছেন। ভেবেছিলাম, দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেবো না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। আমিও ভাবলাম, দেরি করে কি হবে? তোমার জন্য পুরোপুরি পাগল হওয়ার আগেই আমার এ রকম কিছু একটা করা দরকার। কি, ভালো খবর না?

কংগ্রাচুলেশনস।

থ্যাংক ইউ। এতোটা ফরমাল না হলেও চলবে।

না, না, ফরমালিটি নয়। আমি সব সময়ই চেয়েছি তোমার একটা সুযোগ্য পার্টনার মিলুক। নাও আই অ্যাম একসট্রমলি হ্যাপি। একটু জেলাসি হচ্ছে বটে! আনিস তারপর টুম্পার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করেন, আমার কথা মনে থাকবে?

চিরদিন মনে থাকবে আনিস। তুমি জানো না যে, এতো কম সময়ের মধ্যে তুমি আমার মনের কতো গভীরে পারমানেন্ট ইমপ্রেশন ফেলেছো। আই উইল রিমেম্বার ইউ ফরএভার, সোলমেট। তুমি কি পারবে আমাকে ঠিক এ রকম করে ভালোবাসতে, ফরএভার?

চোখটা ঝাপসা হয়ে আসতেই আনিস চট করে করে ঘুরে তাকায় দেয়ালে টাঙানো ম্যুরালটার দিকে, পাছে টুম্পা টের পেয়ে যায়। কয়েক মিনিটের নীরবতার পর আনিস উল্টো প্রশ্ন করেন, তুমি *মামি রিটার্নস* দেখেছো?

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ মামি রিটার্নস?

মুভিটার একটা গানের লাইন মনে পড়ছে।

হ্যা, দেখেছি। কোন গানটার কথা বলছো?

ফরএভার মে নট বি লং এনাফ ফর দিস লাভ।

amit_ahsan2000@yahoo.com

প্রথম প্রেম

পৃথিবীটা অনেক বড়। এই বড় পৃথিবীকে সম্পূর্ণ দেখা কোনো মানুষের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র এই জীবনে নিজ গণ্ডির বাইরের পৃথিবী দেখার সুযোগ আমার হয়নি। নিজের পরিচিত পরিবেশে খালাতো, মামাতো, চাচাতো ভাইদের সঙ্গে প্রেম আমার রুচি বিরুদ্ধ। তাই পরিচিত পরিবেশের বাইরের এক পুরুষকে মন দিয়ে বসলাম।

সে ছিল আমার কোনো বন্ধুর বন্ধু। এক কলেজ ক্যাম্পাসে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। মনটা তখনো হাতছাড়া হয়নি। বয়সটা এমনই তখন যে, মনটা বশ মানতে চাইছে না। পাল তোলা নৌকার পাল জোর বাতাসে দোলা লাগে। জীবনের সেই সময়ে তার আচরণ আমার অল্প বয়স্ক মনে ভালোবাসার সৃষ্টি করেছিল। আমি তখন বয়ঃসন্ধির কোঠায়। শরীর ও মনের নানান রকম পরিবর্তন আমার শৈশব–কৈশোরের মনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সে রোজ বিকেলে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেটে আসতো। আমি সেই বয়সেই বুঝতাম আমাকে নয়, সে পাশের বাড়ির মেয়েটিকেই বেশি ভালোবাসতো। তারপরও তাকেই আমি মন দিয়ে বসলাম।

বন্ধুরা বললো, পোড়ামুখী, দেয়ার মতো আর কাউকেই তুই পেলি না!

আমি পারিনি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসতে।

খুব ভোরে আমার স্কুলে যাবার সময়টাতে সে সাইকেল নিয়ে দাড়িয়ে থাকতো। আমার অবুঝ মন বলতো সে আমার জন্যই দাড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে তার মুড ভালো থাকলে সে স্কুল এরিয়ার কিছু আগে পর্যন্ত সাইকেল নিয়ে আমার পিছু পিছু যেতো।

এভাবেই চলছিল আমাদের। এক অজানা গন্তব্যে আমার মন এগিয়ে চলছিল। একদিকে চকলেট, আইসক্রম যেমন ছেড়ে দিয়ে বড় হতে পারছিলাম না, অপরদিকে তাকেও মন থেকে সরাতে পারছিলাম না।

এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারলাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটা। শুরু হলো তাকে আমার পার্সেল পাঠানো। প্রতিটি বিশেষ দিনকে সামনে রেখে চ্যানেল আই যেমন বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তেমনি প্রতিটি বিশেষ দিনের আগেই আমার পার্সেল পৌছাতো তার ঠিকানায়। তার প্রশ্রয়ের হাসি আমাকে অনুপ্রাণিত করতো আমার কাজগুলো করতে।

ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে কিছু পেতে এতো ইচ্ছা করে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমাকে সে কখনোই কিছু দেয়নি। পরে জেনেছিলাম সেই কারণটা। তার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, প্রতিটা উপলক্ষেই সে আমার নামে একটা কার্ড লিখতো। কিন্তু আমাকে দিতো না তার প্রিয়তমাকে রাগাতে। তার অদ্ভুত প্রিয়তমা তাকে নয়, অন্য কাউকে ভালোবাসতো। এবং তাকেও হাতছাড়া করতে চাইতো না। অন্য মেয়ের প্রতি তার আসক্তি মেয়েটিকে জেলাস করতো।

যাহোক আমার কথা বলতে গিয়ে *শিবের গীত গাইতে* বসলাম। এই অদ্ভুত চতুর্ভুজ অথবা ত্রিভুজ প্রেমের জালে জড়িয়ে আমার জীবন কষ্টকর হয়ে পড়লো। অল্প বয়সে আবেগ বোধহয় বেশি থাকে। তাই হাত কেটে তাকে চিঠি লিখতাম পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। এসব ভালোবাসার উপহারে সে আমাকে উপহার দিতো আদি অকৃত্রিম এক হৃদয় জয় করা হাসি। হাসলে তার গজদন্ত বেরিয়ে পড়তো আর আমি কুপোকাত হতাম।

গজদন্ত ব্যাপারটা কি, যারা জানেন না তারা কুমার বিশ্বজিতের হাসি দেখলেই ব্যাপারটা অবগত হবেন। কুমার বিশ্বজিৎ যখন হাসিমুখে গান করেন, *তুমি রোজ বিকেলে* অথবা *তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে* তখন হৃদয় খান খান হয়ে যায়।

দিনের পর দিন আমার ছাদে দাড়িয়ে থাকা, রোজ রোদ–বৃষ্টি উপেক্ষা করে তার জন্য প্রতীক্ষা। আমার কবিতা, গান, পার্সেল, ফুল একদিন আমাকে তার করুণা পেতে সাহায্য করলো। বন্ধুদের মাধ্যমে সে আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমার কাছে ফোন করলো।

বিশ্ব জয়ের আনন্দ সেদিন অনুভব করেছিল আমার হৃদয়। ছাব্বিশ বছর বয়সে আজও ভুলিনি দশ বছর আগের প্রথম দিনের সেই টেলিফোনের কথাগুলো। পারুকে দেবদাস দিয়েছিল হৃদয় আসন। পারুর আঘাতে চন্দ্রর বুকে মুখ লুকাতো সে। আমাকে সে দিয়েছিল যে চন্দ্রর রোল। চন্দ্রর কাছে চুনিলাল আসতো আর দেবদাসের জন্য ব্যাকুল ছিল চন্দ্র।

এরপর সে একদিন আমাকে মার্ক দিল পরীক্ষার। ফোনে বললো, ভালো লাগে তোমাকে। তবে কারো চেয়ে কম।

উত্তরে বলেছিলাম, পরীক্ষা দিয়ে যাবো যদি মার্ক কোনোদিনও বাড়াতে পারি।

ফোনে যতো সহজে সব কথা বলতাম, সামনে পড়লে সব খিচুড়ি পাকিয়ে যেতো। বোকা হয়ে পড়তাম কোনো কথা মুখে আসতো না।

তারপর একদিন বুকে সাহস নিয়ে তার সামনে দাড়ালাম।

সে ফিরিয়ে দিল আমাকে।

বাসায় ফিরে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করলাম। শরীরের ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে। কিন্তু হৃদয়ের মাঝে দগদগে এক ঘা আজও আছে।

নাম ঠিকানা বিহীন

তৃতীয় পক্ষ

– এম. নবুয়াত আহমেদ

তৃতীয়পক্ষ ছাড়া প্রেম অসম্ভব। অন্তত শহরের না হলেও মফস্বলের প্রেমিক–প্রেমিকারা ঠিকই স্বীকার করবেন। এমনি তৃতীয় পক্ষের ভূমিকায় কিভাবে আমাকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে সাইফ এবং প্রেমার জীবনে তা যায়যায়দিনের মাধ্যমে জানাতে চাই।

সাইফ আমার বন্ধু। স্নাতক সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আর প্রেমা দূরসম্পর্কের বোন, এসএসসি–তে পড়ে। প্রেমাকে সাইফ পছন্দ করতো। কিন্তু মফস্বলের ব্যাপার, সরাসরি বলা অসম্ভব।

একদিন সাইফ আমাকে না জানিয়ে সুন্দর একটি প্রেমপত্র লিখে পোস্ট বক্সে ফেলে আমাদের লাইব্রেরির ঠিকানায়। পিয়ন যখন অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এ চিঠি দিল তখন দেখেই অনুমান করে ফেলি। মনে মনে বলি, সাইফ তুমি বুঝি আমাকে এ কাজে ব্যবহার করলে!

সত্যিকার প্রেমকে সব সময় সমর্থন করি। তাই পরের দিন প্রেমা তার বান্ধবীকে নিয়ে যখন দোকানে আসে তখন অভিনয়ের সাথে বললাম, কি রে, আজকাল দোকানের ঠিকানায় চিঠি আসে, ঘটনা কি?

বলে, চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আর চুপিসারে দেখি প্রেমা চিঠিটা এদিক–ওদিক করে দেখছে অবাক দৃষ্টিতে।

তাদের প্রেম এভাবে শুরু। এরপর তারা প্রায় দেয়া–নেয়া করে। তবে নতুন পন্থায়, হাতে হাতে। চিঠিই তাদের একমাত্র মাধ্যম। কারণ, সরাসরি কথা বলার সুযোগ নেই বলা যায়। সাইফ দুই একটা চিঠি আমাকে দেখাতো।

একদিন হাসিখুশির ওই ছেলেটি মুখ ফ্যাকাশে করে আমার কাছে উপস্থিত। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই একটা চিঠি বের করে দিল। চিঠিতে চোখ রাখলাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিঠিতে সাইফকে *জীবন* নামে সম্বোধন করতো প্রেমা।

কোনো শুভেচ্ছা ছাড়াই আপনার কাছে এ চিঠি লেখা। আমি মনে করি, যদি কোনো শুভেচ্ছা অথবা ভালোবাসা জানিয়ে আপনাকে চিঠি লিখি তাহলে আমার জীবন কষ্ট পাবে।

যাক, প্রসঙ্গে আসি আমি অনেক আগে আপনার নামে খারাপ কথাগুলো শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। তারপরও আপনার মুখ থেকে শোনার ইচ্ছে হলো। তাই সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি আগে কাউকে ভালোবাসতেন কি না? জবাব শুনে আমার মাথা ঘুরে উঠেছে। আসলে আপনারা ছেলেরা যখন যে মেয়েকে

মন চায় ভালোবাসেন আবার স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়েন। আপনি আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসেন না। কিন্তু আপনি আমাকে মিথ্যা বলেছিলেন। আপনি আরো একটি মেয়েকে ভালোবাসতেন। তবে এখন বাসেন না। কারণ, আপনার স্বার্থ পূরণ হয়েছে। তাই সচেতনভাবে আপনি কেটে পড়েছেন। আপনি হয়তো আমার সঙ্গে এ রকম করবেন।

আমি ভাবতেই পারি না। আমার ভালোবাসার ছেলেটি এতো খারাপ যাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে নাম দিয়েছিলাম জীবন অর্থাৎ প্রেমার জীবন।

আপনি ভালো অভিনয় করতে শিখেছেন, তাই বলবো, ওটা আমার সঙ্গে না করে কোনো নাটক মঞ্চে গিয়ে করুন, অনেক টাকা পাবেন। আমার সঙ্গে করে লাভ কি বলুন?

চিঠির শেষাংশে আপনার কাছে আমার একটি স্বপ্ন পূরণের জন্য সাহায্য ভিক্ষা চাইবো। আশা করি, আমাকে নিরাশ করবেন না। যদি কখনো আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আপনার কাছে আমার যতো চিঠি আছে, সবগুলো আমাকে দিয়ে দেবেন। আমার স্বপ্নটা এসব চিঠি নিয়েই। পৃথিবীর সকল প্রাণী যখন গভীর ঘুমে মগ্ন হবে তখন আপনার একটি এবং আমার একটি চিঠি একত্রে করে আগুনে ফেলবো। তাদের মিলন থেকে ছাই হবে। অন্তত সান্ত্বনা পাবো এ ভেবে, জীবনের সঙ্গে আমার মিলন না–ইবা হলো। কিন্তু চিঠিগুলোর তো মিলন ঘটাতে পেরেছি। কারণ, চিঠিগুলো আমার সেই জীবনের লেখা ছিল যে জীবন ভালোবাসতো শুধু একজনকে এবং যাকে সারা জীবন ভালোবাসবো। তবে আপনি তো দুজনকে ভালোবাসেন তাই আপনি আমার ভালোবাসার জীবন হতে পারলেন না। পরিশেষে আশা করবো আমাকে আমার এ স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ আপনি দেবেন।

ইতি

শুধু জীবনের ভালোবাসার মানুষটি

চিঠিটা পড়ে সাইফের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হলো না। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম আরে, প্রেমের মধ্যে টক–মিষ্টি–ঝাল সবই থাকে। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখি কিছু করতে পারি কি না।

পরদিন ভেবে–চিন্তে একটি চিঠি লিখলাম। সেই চিঠিটি নিচে দেয়া হলো :

May Real Love Live Long

হ্যালো প্রেমা,

শোনো, একটি গল্প বলি। ধরো, একটি ছেলে বিয়ে করতে চায়। তখন সে একাধিক পাত্রী দেখে। কেন দেখে? কারণ, সে তার মনের মতো কাউকে চায়। এ জন্য তাকে একাধিক মেয়ে দেখতে হচ্ছে। এটাকে নিশ্চয় তুমি অপরাধ বলবে না। আর এটা যদি কোনো অপরাধ না হয় তাহলে একটা ছেলে অথবা মেয়ে তার প্রত্যাশিত প্রিয়া কিংবা জীবন খুজতে কেন একটু বিচার–বিবেচনা করবে না? স্বয়ং বিচারকও রায় দেয়ার আগে সব কিছু অবগত হয়েই দেন। এবং কারো সম্বন্ধে জানতে হলে তো তার কাছাকাছি অবস্থান করতেই হয়। এ কাছাকাছি অবস্থানকে যদি নিন্দুকেরা *প্রেম* বলে চালিয়ে দিতে চায় এবং তোমার মতো সচেতন কেউ এটাকে বিশ্বাস করে স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়া ভাবে, তাহলে কি আর করা?

সচেতন শব্দটি কেন ব্যবহার করেছি সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে আমি অপ্রত্যাশিত চরিত্রটি কেন তোমাদের মাঝে প্রবেশ করলাম সে প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দিচ্ছি অন্তত এইটুকু তো বুঝেছি যে, আমার এ অপ্রত্যাশিত আগমন অন্তত নিজের স্বার্থে নয় তারপরও এ দোষে দুহাত জড়ো করছি।

আর তুমি যেহেতু আমার বোন সেহেতু সব সময় জীবনকে (চাহিবা মাত্র) সুপরামর্শ দিয়েছি এবং সতর্কও করেছি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে।

তোমার জীবন কেমন? তোমাকে কি উদ্দেশ্যে ভালোবাসে? কতোটুকু ভালোবাসে? ইত্যাদি আমার চেয়ে তুমি কতোটুকু কম জানো উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করি কেউ যদি আমাকে বলে, জীবন অমুক কাজ করেছে। শুনে আমি বুঝতে পারবো সে কি করেছে না করেনি। কতোটুকু করার ছেলে সে? কিন্তু তুমি শুনে বোঝনি। দ্বিধায় পড়ে জিজ্ঞাসা করেছো, উত্তরও পেয়েছো শাদাসিধেভাবে এবং ভুল বুঝেছো। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা উদাহরণ টানতে চাই। আমাদের বন্ধু রাব্বি (চব্বিশ বছর জীবনে) একটি মেয়ে পছন্দ করেছিল। তার নাম লিচু। পরে তার (লিচু) বিস্তারিত জানার পর আর অগ্রসর হয়নি। এখন কেউ যদি তাকে প্রশ্ন করে, লিচুকে না কি তোর পছন্দ হয়েছিল? এখন সে যদি সত্যবাদী হয় এবং তার মাইন্ড যদি ফ্রেশ থাকে তাহলে অবশ্যই হ্যা বলবে। অথচ সে মেয়েটির বাসাও চেনে না। শুধু একবার দেখেছিল। এ অবস্থায় প্রশ্নকারী অন্য কিছু যদি ধারণা করে তাহলে অবশ্যই সেটা ভুল বোঝা ছাড়া কিছুই নয়।

সর্বোপরি জীবন যদি ততোটাই খারাপ হতো তাহলে তা অংকুরেই বিনষ্ট করতাম। পরামর্শ তো প্রশ্নই আসে না। যেমনটি দিইনি তোমার ওই সন্দেহভাজন মেয়েটির ক্ষেত্রে। তারপরও জ্ঞানীদের ভাষায় বলবো মানুষের অতীত জেনো না। বর্তমানকেই জানো এবং এ জানাই যথেষ্ট। এরপরেও ইচ্ছে করলে যে কোনো বিষয়ে সরাসরি আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে যদি মনে কোনো কিছু লুকায়িত থাকে।

পুরনো প্রসঙ্গ সচেতন বিশ্লেষণে তোমার আগে–পরে মিলিয়ে তিন চারটি চিঠি পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার–আমাকে বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে এ সময়েই আমার ভালোবাসা লিজার প্রথম চিঠি পাই। তার লেখার ধরন, প্রকাশভঙ্গি, তোমার চিঠির সঙ্গে এতোটাই মিল! দেখতেও একই রকম মনে হয়, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ব। তাকে আমি সামনা সামনি দেখি না প্রায় সাড়ে তিন বছর। সম্পর্ক ছিন্ন পাচ বছর ছুই ছুই। তারপরও তাকে স্মরণ করি প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত এবং স্মরণ রাখতে চাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তুমিও সে জাতীয় কথাই লিখেছো। অবশ্য এ সময়ে এ জাতীয় কথা সবাই বলে। কিন্তু সত্যি বলে গুটিকয়েকজন। দোয়া করি। তুমি যাতে সে দলে থাকতে পারো। আমার মতো সেই কল্পনার মানুষটি হয় যেন সকল সৎ কাজের ও সৎ থাকার উৎস।

পরিশেষে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হোক তোমার জীবন। আমার ভালোবাসা লিজার চিঠি থেকে ধার করা এ কামনামূলক লাইন ব্যবহার করে ইতি টানছি।

ইতি

একটি পার্শ্বচরিত্র

চিঠিটি পাওয়ার পরপরে তাদের প্রেমের পূর্ণজন্ম হয়। অর্থাৎ পূর্ণগতি আসে। আর এভাবে যুগ যুগ ধরে তৃতীয় পক্ষ বা অন্যের প্রেমকে গতিশীল করে নিঃস্বার্থভাবে।

চরবাটা, নোয়াখালি থেকে

যাতনাময়

– প্রমা

মাফুজের সঙ্গে আমার পরিচয় কলেজ বাসে। মাফুজ তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি তখন সবেমাত্র ইংরেজিতে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে। কলেজ থেকে

আসতে বাসে প্রচণ্ড ভিড় হয়। মেয়েদেরও বাদুড় ঝোলা হয়ে আসতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী বাসে ঠিকই সিট পেতো। এদের মধ্যে একজন ছিল মাফুজ।

আমি নতুন ছিলাম বলে বাদুড় ঝোলায় তেমন একটা অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। সেদিন বাসের গাদাগাদির মধ্যে দাড়িয়ে ছিলাম মাফুজের সিট বরাবর। বাসের গাদাগাদি ও ড্রাইভারের বেপরোয়া চালনায় নিজের ব্যালান্স ঠিকমতো রাখতে পারছিলাম না।

আমার এই দুরবস্থা দেখে মাফুজ তার নিজের দখলের সিটটা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসতে বললো।

পেটে ক্ষিধে, মুখে লজ্জা এই নীতি অনুসরণ না করে নিমেষেই রাজি হয়ে গেলাম। বসে পড়লাম সিটটিতে।

মাফুজ নেমে গেল কোরপাই বাসস্ট্যান্ডে। ফলে সেদিন আর তেমন কথা হলো না। আমি নামলাম চান্দিনা বাসস্ট্যান্ডে।

ভিক্টোরিয়া কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও ইংরেজি বিভাগ পাশাপাশি হওয়ায় প্রায়ই মাফুজের সঙ্গে দেখা হতো। হাসি বিনিময় বা কেমন আছেন জাতীয় কথার মধ্যেই তা সীমিত ছিল।

একদিন ছাত্রশিবির নেতৃত্বাধীন জোট ও ছাত্রলীগের মধ্যকার ক্যাম্পাস সংঘর্ষের সময় আমরা সবাই প্রাণপণে ছোটাছুটি করছি। এমন সময় হঠাৎ মাফুজ ছুটে এসে আমার হাত ধরে বিকল্প রাস্তা দিয়ে কলেজের বাইরে নিয়ে এলো। রিকশায় করে এক সঙ্গে শাসনগাছা পৌছে বাসে উঠে নিশ্চিত ভাবে বসি দুজনে। বাসে উঠে মাফুজের সঙ্গে আমার প্রথম কথা হলো।

কথায় কথায় জানতে পারলাম যে, মাফুজ কোরপাই ভূঞা বাড়ির ছেলে। তার বাবা একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক।

তারপর থেকে আমাদের প্রায়ই দেখা হতো, কথা হতো।

আমি ধীরে ধীরে মাফুজের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় চমৎকৃত হতে লাগলাম। তার সব কিছু আমার ভালো লাগতে শুরু করলো। এসব ভালো লাগা আমাকে অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করলো। কখন যে এই ভালো লাগা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হতে শুরু করলো তা টেরও পেলাম না। কিন্তু মাফুজের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সামনে মোমের মতো গলে যেতাম। তাই তাকে বলতে সাহস পেতাম না।

একদিন তাকে আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করলাম। আমার ব্যবসায়ী বাবার আমি একমাত্র কন্যা। তার উপর আমার বড় দুই ভাই জাপান প্রবাসী। তাই আমার অতিথি হিসেবে মাফুজের একটু অতিরিক্ত আতিথেয়তাই হলো।

আমাদের পারিবারিক অ্যালবামটা বের করে মাফুজকে আমার জাপান প্রবাসী দুই ভাইয়ের জাপানে ওঠানো ছবিগুলো দেখালাম।

এর কিছুদিন পর থেকেই মাফুজের চরিত্রের কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। সে কোনো উপলক্ষে ছাড়াই বিভিন্ন রকম উপহার দিতে আরম্ভ করলো।

সেগুলোর এক একটা হাতে এলে মনে হতো যেন আমার দুই হাতে চাদ ধরে আছি।

একদিন আমার জীবনে এলো সেই পরম মুহূর্ত। আমার জীবনের প্রথম পছন্দের কোনো যুবকের কাছ থেকে পেলাম একখানা প্রেমপত্র! বাসায় এসে সারা দিন চিঠিটাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখলাম। চিঠিটা বুকে জড়িয়ে কখন যে স্বপ্নের দেশে চলে গেলাম টেরও পেলাম না।

এরপর থেকে আমার জীবনের সব স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার পালা এলো। পড়াশোনা শিকেয় তুলে সারা দিন কুমিল্লা শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মাফুজের সঙ্গে।

নিজের শরীরটাকে তখন পাখির পালকের মতো হালকা মনে হতো, যেন ইচ্ছা করলে আকাশে উড়াল দিতে পারবো।

মাফুজের সঙ্গে আমার প্রেমের মৌখিক চুক্তি ছিল প্রতিদিন তাকে অন্তত একটি করে প্রমাণ সাইজের চিঠি লিখতে হবে।

মাফুজ করতোও তাই।

প্রতিদিন চিঠিগুলো মাফুজের কাছ থেকে নিয়ে বাসায় এসে অন্তত বিশবার পড়তাম এবং ঘুমানোর আগে ব্রা–র ভেতর গুজে রাখতাম উষ্ণতার জন্য। চিঠিতে তার হাতের পরশ রয়েছে ভাবতেই আমার ব্রা–র ভেতরের ছোটখাটো ঘুমন্ত পাহাড় দুটো জেগে উঠতো।

একদিন এ চিঠিগুলোই আমার জন্য কাল হয়ে দাড়ালো। বাবা একটা ইংরেজি শব্দের অর্থ খুজতে গিয়ে আমার ডিকশনারির ভেতর থেকে কয়েকটা চিঠি উদ্ধার করে ফেললেন। এগুলোতে বেশ উচু স্তরের ভালোবাসার কথা লেখা ছিল। বাবা আমার জাপান প্রবাসী ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার জন্য তোড়জোড়ে পাত্র দেখতে লাগলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে মাফুজের কয়েকজন বন্ধু–বান্ধবকে সাক্ষী রেখে আমরা বিয়ে করে ফেললাম।

বিয়ের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই আমার বড় ভাসুর নজরুল–এর মাধ্যমে আমাদের বাসায় বিয়ের খবরটা ফাস হয়ে গেল।

বাবা প্রথমে বিয়ে না মানলেও পরবর্তীকালে জাপান প্রবাসী ভাইদের অনুরোধে বিয়ে মেনে নেন।

এরপর আমার জীবনে এলো সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রতীক্ষিত সেই মধুর মিলনের রাত। আমি যখন বাসর খাটে 'দ' হয়ে বসে আছি ডিম লাইটের আলোয় তখন ক্যাসেটে বাজছে চিকন সুরে নজরুল সঙ্গীত, *প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথায়।*

না! মাফুজ রাতটি বৃথা যেতে দেয়নি।

সারাটা রাত ধরে সে আমার ওপর চালিয়েছিল সুখের অত্যাচার। খেলায় খেলায় মাতিয়ে রেখেছিল আমার সারা দেহ। উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলেছিল আমার সম্পূর্ণ হৃদয়, মন। চুমোয় চুমোয় পরিপূর্ণ করে তুলেছিল আমার নগ্ন শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলো। শেষ মুহূর্তে মনে হয়েছিল দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় সুখ আর কি থাকতে পারে!

সে রাতেই পরমভাবে অনুভব করেছিলাম আমার নারীত্বকে। এভাবেই স্বপ্নের মতো রাতগুলো কাটছিল।

মাফুজের একটি ছোট বোন ছিল, নাম শেফালি। ক্লাস টেনের ছাত্রী। তাকে সব সময় আগলে রাখতে চাইতাম।

কিন্তু আমার সঙ্গে সে প্রায়ই খোচা মেরে চটাং চটাং কথা বলতো। বাচ্চা মেয়ে ভেবে কিছু বলতাম না। কিন্তু আমার মনে খুতখুতি তখন থেকে শুরু হলো যখন দেখলাম আমার শাশুড়ির মুখ থেকে হাসি ধীরে ধীরে কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে।

মাফুজের এম এ পরীক্ষা চলে এলো।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো যখন শুনলাম সে পরীক্ষা দেবে না। কারণ হিসেবে মাফুজ যেসব যুক্তি বললো তার অধিকাংশই অযৌক্তিক। আর সব কিছুর মূলে হচ্ছে আমার জাপানে থাকা ভাই। মাফুজের আসল ইচ্ছা হচ্ছে, সে বিদেশ যেতে চায়। এক্ষেত্রে সে আমার ভাইদের সাহায্য চায়।

ঘটনা বুঝতে পেরে অজানা আশংকায় কেপে ওঠে আমার বুক। এর কয়েকদিন পর থেকে মাফুজকে জাপান পাঠানোর কথাটা বেশ রাখঢাক ছাড়াই আমার শ্বশুর–শাশুড়ি ও ভাসুররা আমাকে বলেন।

আমি বলি, সে রোজগার করে যদি আমাকে শুকনো রুটিও খাওয়ায় তবুও আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমার ভাইদের কাছে আমি হাত পাততে পারবো না।

এরপর থেকে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি মানুষের আচরণ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমার হাতের মেহেদির রঙ মুছতে না মুছতে আমার শাশুড়ি আমাকে চুলা, গোয়ালঘর থেকে শুরু করে সব গৃহস্থালি কাজ করাতে শুরু করলেন।

এসব কাজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম বলে সব সময়ই শাশুড়ি ও ননদের নির্মম কটূক্তি শুনতে হতো। সব কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মাফুজের জাপান যাওয়ার ইচ্ছাকে পূর্ণ করা। কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব ও সিদ্ধান্তে আমি অটল থেকে যাই।

এদিকে মাফুজও সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সারা দিন বাইরে থেকে রাতে ঘরে এসে আমার সঙ্গে বর্বর আচরণ করতে থাকে। মাফুজ যখন বুঝতে পারলো তার দুর্ব্যবহারেও আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবো তখন সে নতুন হাতিয়ার আবিষ্কার করলো। প্রতিদিন বাইরে থেকে নতুন নতুন সব উপায় শিখে এসে রাতে আমার নগ্ন দেহটার ওপর চালাতে লাগলো বিকৃত যৌন অত্যাচার। মাঝে মধ্যে নেড়ি কুকুর যেমন ডাস্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া হাড় চিবোয় তেমনি আমার স্তন দুটো কামড়াতে থাকে।

ব্যথায় কুকড়ে উঠি। দাতে দাত চেপে সহ্য করি সকল অত্যাচার।

একদিন আমার এক বান্ধবী এসে আমার এ দুরবস্থা দেখে বাবাকে জানায়।

আমার বাবা ও ভাইয়েরা বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

আমি ফিরে যাই না।

আমার সঙ্গে মাফুজ যতোই খারাপ ব্যবহার করুক, যতোই অত্যাচার চালাক, আমার মনে তার জন্য নেই এতোটুকু ক্ষোভ বা অভিযোগ। আমার হৃদয়ে মাফুজের জন্য ভালোবাসা এতোটুকুও কমে না।

হায়রে ভালোবাসা, কতো না বিচিত্র ও রহস্যময়ী তুমি! তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গীদের শুধায়েছিলেন *সখী ভালোবাসা কারে কয়? সে কি কেবলি যাতনাময়।*

রূপনগর, কুমিল্লা থেকে

সমর্পণ

– সাবেত

আজ অনিকের চাকরিটা চলে গেল। বেচারা ভাবতেও পারেনি বসের সঙ্গে রাগারাগির খেসারত তাকে এভাবে দিতে হবে। অনিকের পাবলিক রিলেশন্সের চাকরি। তাকে বস এবং ক্রেতা দুজনেরই মন যুগিয়ে চলতে হয়।

গত কিছুদিন ধরেই তার সন্দেহ, হচ্ছিল বস তলে তলে কোনো দুই নাম্বারি করছে। সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হলো যখন ক্রেতারা অবজেকশন জানানো শুরু করলো। সে যখন বসের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললো তখন বস সব দোষ তার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করলেন। এ নিয়ে প্রথমে মনোমালিন্য, পরে রাগারাগি এবং অবশেষে ফলাফল চাকরি হারানো।

আজ থেকে দুই বছর আগে হলেও অনিক এ নিয়ে মাথা ঘামাতো না। একা মানুষ, এক ভাবে না এক ভাবে চলেই যেতো। কিন্তু এখন তার জীবনে এসেছে নীরা যেন মেঘলা দুপুরে এক ঝলক সূর্য। আজ হঠাৎই কেন জানি তার নীলার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ছে।

অনিক তখন মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। মেধাবী, সুদর্শন, একটু কম স্মার্ট এবং সর্বোপরি মেয়েদের দেখলে একশ হাত দূর দিয়ে চলে যাওয়া এক লাজুক তরুণ। সেদিন প্র্যাকটিকাল ক্লাস শেষে সে কিছুটা আনমনা হয়ে হলে ফিরছিল। হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েলি কণ্ঠে ডাক, এক্সকিউজ মি।

অনিক প্রথমে ভাবলো মনে হয় অন্য কাউকে ডাকছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আবার ডাকলো তখন সে ফিরে তাকাতেই দেখলো শান্ত এক জোড়া চোখ, খাড়া নাক, মাঝারি উচ্চতা, উজ্জ্বল শ্যামলা বর্ণের এক সুন্দরী, যে কি না তার ডিপার্টমেন্টেরই এক জুনিয়র মেয়ে।

কি ব্যাপার? অনিকের প্রশ্ন।

আপনি সেদিন সেমিনারে যে প্রেজেন্টেশনটা করেছেন তা আমার খুব ভালো লেগেছে। ইন ফ্যাক্ট, এতো জটিল বিষয়টা আপনি এতো সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। রিয়ালি গ্রেট। এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো নীলা।

লাজুক অনিক লজ্জায় মোটামুটি লাল হয়ে কেবল ধন্যবাদটা দিতে পেরেছিল। তার কোনো বিষয়ে কেউ প্রশংসা করবে, তাও নীলার মতো সুন্দরী মেয়ে সেটা সে ভাবতেও পারে না?

তারপরই নীলা বায়না ধরলো তাকে পড়াতে হবে। তার কাছে নাকি পড়াশোনা ব্যাপারটাই জটিল লাগে।

অনিকের তখন ছেড়ে দে মা কেদে বাচি অবস্থা। সে অনেকভাবে নীলাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো।

কিন্তু নীলার এক কথা। তাকে না পড়ালে সে ইয়ার ফাইনালে ফেল করবে। এবং এর জন্য নাকি একমাত্র দায়ী থাকবে অনিক।

সে এক জটিল অবস্থা। অবশেষে অনিককে রাজি হতেই হলো। তারপর! তারপর দুজনে এক সঙ্গে পড়াশোনা, অল্প অল্প চেনা–জানা–বোঝা, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, টিএসসি, ১৬ ডিসেম্বর, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ।

এর মধ্যেই নীলার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এতোদিনে তারা নিজেদের অজান্তেই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে। তাই নীলাকে পরীক্ষা ছেড়ে গেলেও অনিককে নীলা ছাড়তে পারলো না।

আর অনিক! সে তো নীলার চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গি, হঠাৎ হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া, সব কিছুই ততোদিনে মুগ্ধ নয়নে দেখতে শুরু করেছে। তারপর হাতে হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে বুক ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে তাদের শুধুই ছুটে চলা।

এর মাঝেই অনিকের মোটামুটি বেতনের এই চাকরি। অনিকের চোখে আজও ভাসে, সেদিন কি অসম্ভব খুশি হয়েছিল নীলা। প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারেনি। শুধু ডাগর ডাগর চোখ মেলে অনিকের মুখে কি জানি খুজছিল। তারপর হঠাৎই চোখ বেয়ে বড় বড় ফোটায় অশ্রু ঝরা শুরু করলো। অনিক তো অবাক!

নীলার এই রূপ কোনোদিন সে দেখেনি। কান্নাভেজা কণ্ঠে নীলা বললো, দোয়া করি, তুমি আকাশের চেয়েও বড় হও।

অনিকের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হয়নি। সে নীলাকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে কেবল বলেছিল, আমরা এক সঙ্গেই বড় হবো পাগলী। সেই সঙ্গে নীলার কপালে একে দিয়েছিল এক স্নিগ্ধ চুমু।

চাকরি পাবার ছয় মাসের মাথায়ই নীলা তার স্ত্রী। আজ তাদের ছোট্ট দুই রুমের ফ্ল্যাটখানা দেখলে মনে হয় স্বর্গেও বুঝি এতো সুখ নেই।

কিন্তু আজ অনিকের চাকরি নেই। সে কিভাবে নীলাকে এ কথা জানাবে ভেবে পাচ্ছে না। তার প্রিয়ার মুখে সে কোনো দুশ্চিন্তার রেখা সহ্যই করতে পারবে না। তাছাড়া আগামী মাসে নীলার জন্মদিন। সে ভেবেছিল তার আদরের বৌকে একটা সোনার নেকলেস উপহার দেবে। পাগলীটা সাজতে এতো পছন্দ করে!

বেতন যা পায় তাতে নেকলেস কেন এক জোড়া কানের দুল দেবারও সামর্থ নেই অনিকের। কারণ, বেতনের সিংহ ভাগই চলে যায় বাড়ি ভাড়া ও সংসার খরচে। তার ওপর নীলার ফাইনাল ইয়ার চলছে। সে ভেবেছিল চাকরিটা স্টেবল দেখিয়ে ব্যাংক থেকে কিছু লোন নিয়ে নীলাকে উপহার দেবে। তারপর কিস্তিতে সে ঋণ শোধ করবে। এখন যে, সংসার চালানোই দায় হয়ে দাড়িয়েছে!

সে যে কতোক্ষণ এসব ভাবতে ভাবতে হাটছিল তার খেয়ালই নেই। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেতেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে রাত এগারোটা। যাহ! অনেক রাত হয়ে গেল। নীলা নিশ্চয় চিন্তা করছে। অনিক বাসার দিকে এক বুক হতাশা নিয়ে পা বাড়ালো।

অনিক বেল দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই সঙ্গে নীলার উৎকণ্ঠিত গলা, আজ এতো দেরি কেন? আমি তো চিন্তায় চিন্তায় হঠাৎই নীলার মনে হলো অনিককে কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগছে...। অনিক তোমার কি হয়েছে? তোমাকে এ রকম লাগছে কেন? আমার ভয় করছে... বলতে বলতে সে অনিককে ধরে সোফায় বসালো।

অনিক লজ্জা, অপমানে মুখ তুলতে পারছে না।

এই অনিক, তোমার কি হয়েছে? আমার দিকে তুমি তাকাচ্ছো না কেন? নীলার চোখ ছল ছল। সে কখনো অনিককে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখিনি। তারচেয়েও বড় কথা, তার অনিকের মন খারাপ!

অবশেষে অনিক মুখ তুললো। নীলার মুখটা দেখলো। ঠিক যেন একটা সদ্য ফোটা গোলাপ। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠায় যা পরিণত হয়েছে শাশ্বত প্রেমের পবিত্র প্রতীকে। সে নীলার চোখ মুছিয়ে দিয়ে ক্লান্ত গলায় বললো, আমি হেরে গেলাম নীলু। আমাকে ক্ষমা করো। অন্যায়ের কাছে আজ আমি পরাজিত। আমি এখন বেকার। এ কথাটা বলেই সে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো।

নীলা হাত বাড়িয়ে অনিকের হাত দুটি ধরলো। অনিক সবিস্ময়ে অনুভব করলো এই ক্ষীণ দুটি হাতে কি প্রচণ্ড নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস যা ধীরে ধীরে অনিকের মাঝে সংক্রমিত হতে লাগলো।

আজিমপুর, ঢাকা থেকে

ব্যর্থ

– মাহবুবুর রহমান ভূইয়া মনজু

১৯৯৫। তখন আমি সীমাহীন প্রাচুর্যের দেশ ওমানে প্রবাসী। ওমানস্থ বিদেশি একটা কনস্ট্রাকশন ফার্মে সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। দিনে কাজের ব্যস্ততা। সন্ধ্যা হলেই টেলিফোনে দেশের বাড়ির আত্মীয় পরিজনের খোজখবর নেয়াতে ব্যস্ত থেকেই দিনগুলো কাটাচ্ছি।

বছরান্তে ছুটির সুবিধা থাকলেও একদিকে বিদেশি মালিকের মন জয় করার চিন্তা, অন্যদিকে পেট্রডলার জমানোর নেশায় ছুটি না ভোগ করে টানা পাচ বছর কাটিয়েছি। কানে সারাক্ষণ একটা কথা বাজতো, প্রিয়তমা বলেছিল, পকেট ভারী না করে সংসার বাধবো না। যদিও প্রিয়তমা প্রতিশ্রুতি ভুলে ইত্যবসরে অন্যের সংসার সাজাতে চলে গেছে।

পাচ বছরের প্রবাসী জীবনে সংসারের হাল ধরা প্রিয় বাবাও পরলোকে চলে গেছেন। বাবার কথা রাখতে পুত্রবধূর মুখ দেখার আবদারের কাছে ইতিমধ্যে বড় ভাই বিয়ে করে সংসারি হলেন। বাবা চলে গেলেন।

মা সুখী হতে পারলেন না। বিশেষ করে বাবার শোক কাটতে না কাটতে মা দেখলেন গুরুজনের প্রতি বড় বৌয়ের তাচ্ছিল্যের আচরণ। সবই জানাতেন ফোনে আমাকে। কিন্তু আমার তো করার কিছুই নেই। মাকে জানালাম, মেজবৌ ঘরে আনুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাধবে? কারণ, আমার ওপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস। সে চিন্তায় অস্থিরতায় কাটালাম কিছুদিন। সিদ্ধান্ত নিলাম প্রবাসে থেকে মেজভাইকে বিয়ে করাবো। যেই ভাবা সেইভাবে কাজ।

আমার সহকর্মী মুশফিকের খালাতো বোনের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা হলো। মুশফিকুর রহমান আমার অধস্তন ইঞ্জিনিয়ার। সদ্য বিদেশে এসেছে। তার কাছে থাকা খালাতো বোনের ছবি দেখালো আমাকে। মেয়ে পছন্দ হলো আমার।

সে দেশে তার পশু সম্পদ কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত খালুকে জানালো। আমিও দেশের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। মেয়ের বায়োডাটা জানালাম।

সপ্তাহ শেষ হতো মা ফোন করলেন মেয়ের আত্মীয়–স্বজন, বাড়ি–ঘর দেখা হলো বলে। ঠিক হলো ফেনী জেলার ফুলগাজি উপজেলার বড়ইয়া গ্রামের এ মেয়েই হবে আমার মেজভাবী।

দুই বোন, দুই ভাইয়ের সংসারের বড় মেয়ে টুম্পা আমার প্রিয় মেজভাবী হয়ে এলেন। স্বামীর ঘরে এসেই এ উকিল, ঘটকপ্রবর, দেবরবাবু সম্পর্কে জানলেন। শ্বাশুড়ির কাছ থেকে ঠিকানা নিলেন। ধন্যবাদে সিক্ত করে চিঠি দিলেন। চিঠিতে অনেক মজার কথা লিখতেন। তার লেখার বুনন ঠিক ছিল। হাতের লেখাও আমার চেয়ে ভালো। চিঠিতে আস্তে আস্তে নিজের সংসার সম্পর্কে লিখতেন। ফাকে ফাকে বাবার সংসার সম্পর্কেও লিখতেন।

চিঠি দেয়া–নেয়ার ক্রমধারায় বছর ঘুরতে না ঘুরতে একদিন আপন একমাত্র বোনের বিয়ের প্রসঙ্গ জানালেন। বোনটা নাকি কোনো এক প্রবাসী স্যারকে বিয়ে করবে। সে প্রেমিকের অপেক্ষায় বোন বসে থাকবে, বিয়ে করবে না।

এসব কথায় ভাবীকে আমিও লিখতাম, প্রবাসী পাত্র হলে তো বেয়াইনের পছন্দ ভালো, নাহয় অপেক্ষা করুন। ভাবী তাদের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতেন।

ভাবীর আব্বা সরকারি চাকরির সুবাদে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন বড় শহরে রেখে। কিন্তু এখন তো চাকরিতে অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। এলাকার বখাটে তরুণরা শহর ফেরত এসব মেয়েদের নানানভাবে উত্যক্ত করছে। অপেক্ষা করলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক চাপে বেয়াইন আর প্রেমিককে দেয়া কথা রাখতে পারেনি।

বেয়াইনকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ফেনী জেলার দাগনভূইয়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সংসার করতে। ভাবীর প্রচণ্ড দাবি ছিল যেন সময় মতো দেশে ফিরে বেয়াইনের বিয়েতে শরিক হই।

ভাবীর আবদার রাখতে পারলাম না তাও এক কারণে। মালিকের সঙ্গে আলাপ করে ছুটির সাব্যস্ত হলো। বাজারও করেছি। দীর্ঘ ছয় বছর পর বাড়ি যাবো বলে কথা! হঠাৎ এক বিকেলে দেশের আমার এক বন্ধু ফোন করে জানালো, আমার প্রেমিকা শম্পা অন্যের হয়ে যাচ্ছে। দিনক্ষণও ঠিক হয়েছে।

মনে জোর পেলাম না। বেয়াইনের বিয়ে উপলক্ষে যদি দেশে ফিরে আসি তাহলে প্রেমিকা খবরটা পেলে অনাহূত কিছু ঘটে যায়। বরং এই ভালো, যে যাওয়ার চলে যাক, পরিবেশ ঠিক হোক। অতঃপর ঘরে ফিরে আসবো।

পরে, চিঠিতে ভাবী জানালেন তিনি খুব আশায় ছিলেন, আমাকে না পেয়ে বোনের বিয়েতে নিজেও যাননি। আমার মা নাকি খুব আশা করেছিলেন এ অছিলায় ছেলেকে দেখতে পাবেন।

মা ফোন করে কারণ জানতে চাইলেন।

মাকে চাকরির ব্যস্ততার অজুহাত দেখালাম।

তিনি অনুযোগ করলেন সহসা দেশে ফিরতে।

ছেলেকে কাছে পেতে মা উদগ্রীব। ভাবী বার বার লিখছে দেশে ফিরতে।

অবশেষে পৌষ মাসের এক শীতার্ত রাতে তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে আকাশে উড়াল দিলাম। সোজা মাকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু আমার দেশে রেখে যাওয়া সে মাকে যেন পেলাম না। মার শরীর আগের চেয়ে অনেক ভেঙে গেছে। মেজভাবীর যত্ন মাকে যেন পরপারের হাতছানি থেকে আগলে রেখেছে।

ভাবীর আদরে সিক্ত হলাম। ভাবীর ছোটখাটো অনুযোগ আর আদেশ পালন করছি। সময় বুঝে ভাবী চেপে ধরলেন তার বোনের বাড়ি বেড়াতে যেতে।

এক বিকেলে বেয়াইনকে দেখতে যাবো সিদ্ধান্ত হলো। বেবিট্যাকসি রিজার্ভ করলেন ভাবী। এবং বেয়াইনের স্বামীর বাড়ির সীমানায়ও এসে গেলাম। বাড়িতে ঢুকতে যাবো, ভাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতো আমার পরম বন্ধু রিপনদের বাড়ি।

শুনে ভাবী বললেন, হ্যা! চেনো নাকি? রিপন তো শম্পার স্বামীর নাম!

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। বাড়ির গেট পেরিয়ে এগিয়ে যেতে শরীরটা অবশ হয়ে এলো। সামনে দাড়িয়ে আছে আমার হারিয়ে যাওয়া মানবী শম্পা রেজা। বুক ফেটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো একটা আত্মচিৎকার, হায়রে! কি করলি তুই শম্পা? কি করবো আমি! বসে পড়লাম। পেছনে দাড়ানো আমার ভাবী। হারিয়ে গেলাম স্মৃতিতে।

তখন আমি ফেনী পলিটেকনিক–এ ইঞ্জিনিয়ারি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। থাকতাম শহরের বনানী পাড়ায় এক পশু সম্পদ কর্মকর্তার বাসায় লজিং কাম পেয়িং গেস্ট হিসেবে। ভদ্রলোকের বাড়ি ফেনিতে। বাসায় তিনি, তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে টুম্পা ও শম্পা। টুম্পা ক্লাস সিক্সে এবং শম্পা ক্লাস ফাইভে পড়তো ফেনি *জিএ একাডেমি*–তে। তাদের বাসায় থাকতাম, খেতাম, বিনিময়ে তার মেয়ে দুটাকে পড়াতাম। খালাম্মা আমাকে *জামাই* বলে ডাকতেন। ভাবতাম হয়তো অতি আদরে এ সম্বোধন হবে। খালাম্মাই একদিন কারণটা ব্যাখ্যা করলেন। বাবা আমাদের ছেলে নেই তো তোমাকে তো ছেলে বানানো যাবে না, বরং তুমি না হয় জামাই হলে! আর পায় কে! আমি তো কথাটা সত্য ফলাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

দিন যায়, বছর যায় আমি ছোট্ট শম্পার ওপর ভরসা করি। তাকে আমি ভালোবাসতে চাই। বুঝতে বুঝতে শম্পার বয়স বাড়ে। ফাইভ ছেড়ে ক্লাস সেভেনে পৌছে। শম্পা বুঝতে শিখে ভালোবাসা, আমি দেখাতে থাকি আশা। শম্পা সম্মতি জানায়, বড় হতে বলে, টাকা রোজগার করে ধনবান হতে বলে।

আমিও আশায় বুক বাধি। টাকার জন্য বিদেশ পাড়ি দিই। কিন্তু টাকা তো হলো, শম্পা কই? হতাশায় চেয়ে দেখি শম্পার ঘর–সংসার। শম্পা আমার হলো না – যার হলো সে আমার এক সময়ের সহপাঠী।

ছুটিতে এসে আর বিদেশ ফেরা হলো না। বিদেশ করবো কার জন্য? হতাশায় বেকারত্ব পেয়ে বসলো আমাকে। একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করলাম ফেনিতে। আশাহীনের উপায় হয় না। দুই বছরে ব্যবসায় লালবাতি জ্বলে।

মেজভাবী চাপাচাপি করেন বিয়ে করতে।

আমি রাজি হই না। বেকারত্ব থাকলে বিয়ে করতে হবে। তাই বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসি। সময় বলবে, ব্যর্থ প্রেমিকের বিয়ে করা উচিত হবে কিনা।

ফেনী থেকে

মিথ্যা

– পিয়াল

হ্যা, এটা সত্যি যে, ভালোবাসা প্রতিটি মানুষের জীবনে আসে। কারো আগে, কারো পরে। কারো জীবনে সেটা সুখের। কারো জন্য খুবই বেদনাদায়ক। আমার জীবনেও কি সেটা এসেছিল?

ভালোবাসা সম্পর্কে আমার ধারণা প্রাচীন। বিশ্বাস করতাম ও করি, জীবনে একজনকেই ভালোবাসা যায় এবং একবারই সত্যিকারের প্রেমে পড়া যায়। সে বিশ্বাসেই কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির জীবনে ভালোবাসাকে অনেকটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে, কর্মজীবনের শুরুতে কাউকে ভালোবেসে সেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া সহজ হবে।

ঢাকায় মাস্টার্স শেষ করে পাড়ি দিলাম সুদূর নিউ ইয়র্ক শহরে। অচেনা দেশে প্রাথমিক ঝামেলা সামলে ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে এবং জীবনে প্রথম শুরু করলাম ভালো লাগার মানুষের সন্ধান। সামাজিক বা ধর্মীয় যে কারণেই হোক, দেশি মেয়েরাই ছিল আমার একমাত্র পছন্দ।

কিন্তু এখানকার ভালোবাসা আমার প্রাচীন ধারণার সঙ্গে মিল খায় না। এখানে দেশি-বিদেশি প্রায় ছেলেমেয়েদের কাছে ভালোবাসাটা স্বল্প স্থায়ী। এ জন্য স্বাভাবিক ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলে ভালোবাসা ভাঙার খেলা।

নিজের চারপাশের ছোট্ট গণ্ডিতে মনের মতো কাউকে না পেয়ে ভাবি, বিশাল ভারচুয়াল ওয়ার্ল্ডে মানে ইন্টারনেটে খুজতে হবে। হয়তো সেখানে খুজে পাবো আমার মনের রানী খাটি বাঙালি কাউকে।

এভাবেই বিভিন্ন বাংলাদেশি ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে বেশ কিছু বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে চলে ইমেইলে যোগাযোগ, টেলিফোনে কথা বলা ও ছবি লেন-দেন। কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত প্রাচীন ভালোবাসার সঙ্গে কাউকে মিল পেলাম না।

অবশেষে পেলাম সম্ভাব্য একজন। সে বসবাস করতো আমার থেকে বেশ দূরে ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায়। ভাবলাম অবস্থানের দূর কিছুই না যদি মনের অনেক মিল পাওয়া যায়। কিন্তু তার খেলাটা ছিল বড়ই কঠিন।

প্রতিদিন তাকে লিখতাম এবং তার ইমেইলের জন্য অপেক্ষা করতাম। সে খুব কমই আমাকে লিখতো। সপ্তাহে মাত্র একবার। বেশির ভাগ চিঠি থাকতো বেদনাদায়ক বাক্যে ভরপুর। এভাবে অনেক দিন অনেক যন্ত্রণা ও আবেগ প্রকাশের পর মিললো তার ফোন নাম্বার। কিন্তু শর্ত, সে যখন বলবে তখন কল করা যাবে। শর্ত মেনে নিয়ে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে চলি।

প্রতি রবিবার তার বাবা-মা দুজনেই কাজে থাকেন। সুতরাং সেদিন কথা বলা যাবে। প্রতিদিন ইমেইল করতাম এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম রবিবারের জন্য কখন কথা হবে। এভাবে দুজন মনের অনেক কাছে চলে এসেছিলাম। আমার প্রায় সব সময়ের দাবি ছিল কখন সে ছবি পাঠাবে যদিও আমারটা অনেক আগেই পাঠানো হয়েছিল।

প্রতি রবিবার চার পাচ ঘণ্টা কথা বলার পরেও যার ছবি পাঠাতে এতো আপত্তি সেটা নিয়ে আমার প্রথম সন্দেহ জাগে। আসলেই কি সে সেই ব্যক্তি যেভাবে সে নিজেকে আমার কাছে বর্ণনা দিয়েছে?

তারপর তার আসল খেলা শুরু হয়। বলে, আমি আজ থেকে দুই মাস পরে নিউ ইয়র্কে আসবো বেড়াতে। যেহেতু আমি সশরীরে আসছি সেহেতু ছবি পাঠানোর কি প্রয়োজন?

এর মধ্যে চলে তার মিথ্যা বলা। নির্ধারিত দিন নিউ ইয়র্কে আসার আগের সপ্তাহে সে বলে, তার আসা হচ্ছে না।

এই সংবাদ আমাকে বিস্মিত ও ব্যথিত করে।

সে বলে, তার বড় বোনের বিয়ে হচ্ছে লন্ডনে। সে আগে বলেছিল তার কোনো বড় বোন নেই।

সে বলে, পরিবারের সবার সঙ্গে লন্ডনে যাচ্ছে মামার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে। সুতরাং সে সময় বাসায় কেউ থাকবে না এবং কল করে কাউকে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কল করে তাকেই পাওয়া গেল। আমি হতবাক! কেন সে এভাবে মিথ্যা বললো?

তারপর একদিন সে সবটা খুলে বললো। এতোদিন সে যেসব কথা বলেছে তার শতকরা পচানব্বই ভাগ বানানো এবং সে মজা করার জন্য করেছে! কিন্তু সে ভালোবাসায় পড়েছে ফান (Fun) করতে করতে। এবং এখন থেকে সত্য বলবে।

ভাবলাম, মিথ্যা দিয়ে যার শুরু তাকে কি সত্যিকারে সত্য রূপে প্রকাশ করা সম্ভব? আমি সুন্দরের পূজারি। মিথ্যা, অসত্য আমার ধাতে সয় না।

তাকে প্রতিজ্ঞা করালাম আর কোনো মিথ্যা নয় এবং সেটা করেছিলাম, প্রাচীন ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, প্রথম প্রেমকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। অল্পদিনের মধ্যে আবার পুরনো রূপে ফিরে গেল। প্রতিবার আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া ও ছবি নিয়ে তার নাটকের অবসান হলো না।

এভাবে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয় এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রভাব পড়তে থাকে। ঠিকমতো কাজকর্ম পড়ালেখা করতে পারি না এবং পরীক্ষায় গ্রেড হলো নিম্নগামী।

সবশেষে মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিই, ওয়াশিংটন ডিসি–তে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো। সে যদি সত্য হয়, তাকে গ্রহণ করবো এবং যদি মিথ্যা হয়, তখনই তাকে ছেড়ে দেবো।

আমেরিকাতে কারো লাস্ট নেম জানা থাকলে তার বাসার ঠিকানা ও ড্রাইভিং ডিরেকশন বের করা কঠিন না। সেটাই করেছিলাম ও তার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হলাম। কিন্তু তাকে বললাম না, আমি আসছি।

সেদিন ছিল ১১ মার্চ রবিবার। প্রতি রবিবার তাকে কল করতাম ঠিক সকাল আটটায়। সে রবিবারও করেছিলাম। কিন্তু ভিন্নভাবে।

আমার ভালোবাসার শেষ অপারেশনের জন্য মধ্য রাতে বের হয়ে পড়লাম নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে। ঠিক আটটায় তাকে কল করলাম তার বাসার পাশের পাবলিক পে ফোন থেকে।

প্রথমে সে বিশ্বাস করেনি, কেউ এতো সকালে আড়াইশ মাইল দূর থেকে এসে কল করতে পারে। তারপর আমি চার পাশের পরিবেশের বর্ণনা দিই ও টেলিফোনে তার বাসার পাশ দিয়ে চলা ট্রেনের শব্দের।

বিশ্বাস করলো আমি সত্যিই তার বাসার পাশে।

অনুরোধ করলাম বাসা থেকে বের হয়ে আসতে। অনেক দূর থেকে এসেছি, তাকে একবার দেখে যাবো।

কিন্তু সে কোনোমতেই রাজি হলো না বাসা থেকে বের হতে। বললো, লোকে দেখলে, আমার বাবা জানলে আমাকে মেরে ফেলবেন ইত্যাদি।

অনেক আকুতি–মিনতি করার পর সে রাজি হয়েছিল।

তাকে দেখেছিলাম দূর থেকে এবং দেখে আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। একজন মানুষ কিভাবে এতো মিথ্যা বলতে পারে এবং তাও ভালোবাসার নামে?

সেদিন ওয়াশিংটনে অনেক ঠাণ্ডা ছিল। ঝড়ো বাতাস শীতের তীব্রতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা আমার সেদিনের বেদনা, মন ভাঙার কঠোর কষ্টের কাছে কিছুই ছিল না।

নিউ ইয়র্ক থেকে
piyal222@yahoo.com

নানির প্রেম

– আবদুল জলিল

আমার যেই বয়স সেই বয়সে প্রেমে পড়ার কথা ছিল একজন ষোড়শী বা অষ্টাদশী যুবতীর প্রেমে। কিন্তু আমি প্রেমে পড়লাম চল্লিশউর্ধ্ব এক বুড়ির প্রেমে। আমি ওর প্রেমে এতোই বিভোর যে, ওকে ছাড়া একটি মুহূর্ত কল্পনা করা আমার কাছে খুবই কষ্টকর। যেদিকে তাকাই, শুধু তার ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

উনি হলেন আমার একমাত্র নানী মা।

১৯৯৪ সালে যখন ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই তখন পাশের বাড়ির একটা ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে হলো আমার মায়ের উকিল, চাচাতো ভাই, মানে আমার মামা। বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাকে মামা বলে সম্বোধন করতাম। তবে ওঠা–বসা ও চলাফেরায় ছিলাম আমরা একে অপরের ক্লোজ ফ্রেন্ড। আমাদের মধ্যে এতোই ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, একে অন্যের জন্য মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারি। এমন অজস্র প্রমাণ আছেও। তাই স্কুলেও আমাদের সুনাম ছিল।

আমরা যখন একে অন্যের বাড়িতে আসা–যাওয়া করতে লাগলাম তখন দেখলাম তার মা–বাবা, ছোট তিন ভাইবোন আমার পরম বন্ধু হয়ে গেলেন। আমার নানিমা তো আমাকে ভাই বলে স্বীকার করলেন। লক্ষ্য করলাম, সন্তানের দিকে মা যেভাবে নজর দেন, নানিও আমার প্রতি সেভাবে নজর দিতে লাগলেন।

আমিও নানির প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লাম। বুঝলাম নানিই আমার পরম আপনজন।

আমি না গেলে নানি ভাত খান না।

আমিও নানিকে ছাড়া ভাত খেলে তৃপ্তি মেটে না। একবেলা ঘরে খেলে দুবেলা খাই নানির ওখানে।

বলে রাখা ভালো, আমি ছিলাম নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে। বাবা না থাকায় বড় ভাই ছিলেন একমাত্র অবলম্বন। আমি ওর কাছে ছিলাম সন্তান তুল্য। আর সেই ভাই বিয়ে করার পর আমাদের সংসারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। আমাদের সামনে ভাবী যখন মাকে গালমন্দ করতেন, তখন নিজেকে সামাল দিতে না পারলে তর্ক করতাম।

সে কথা শুনে ভাই আমার ওপর হাত তুলতেও কুণ্ঠাবোধ করলেন না। আমার পড়ালেখার খরচও কমিয়ে দিলেন যা দিয়ে আমার খাতা কলম কেনা ছিল কষ্টকর। আর মায়ের এই কষ্ট দেখে নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো।

নামাজ পড়ে বুক ভাসাতাম আর বলতাম, হে আল্লাহ, জীবনে বেশি কিছু চাই না। আমাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেও যাতে মায়ের চোখের পানি মুছতে পারি।

নানি কার কাছে যেন আমার এই দুরবস্থার কথা শুনতে পেলেন। নানাকে বলে স্কুলের পাশে আমার জন্য একটা দোকান ঠিক করে দিলেন বই, খাতা, কলম ও দুপুরের নাশতার জন্য। মাস শেষ হলে নানা বিল দিয়ে দেন। এভাবেই চলতে লাগলো আমার দুঃখময় জীবন।

নানির সঙ্গে এতোই ক্লোজ ছিলাম যে, নানির সব সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনা সব কথাই বলতেন কোনো কথাই গোপন রাখতেন না। কখনো মায়ের মতো আবার কখনো বন্ধুর মতো। মাঝে মধ্যে বসে জিজ্ঞাসা করতেন মামা, ভাগিনা কারো সঙ্গে প্রেম করি কি না। মেয়েটা দেখতে কেমন, চোখের চাউনি সুন্দর কি না, আরো অনেক প্রশ্ন।

বলতেন ভাইজান বলো, আজ হোক আর কাল হোক, আমাকেই সালাম দিতে হবে।

তখন খুব লজ্জা পেতাম। তবে ভালো যে লাগতো না – তা নয়। কারণ, এই বয়সে প্রেমের কথা শুনতে কার না মন চায়! অবসর পেলেই নানিকে নিয়ে সবাই এক সঙ্গে বসে দাবা, লুডু, ক্যারম ইত্যাদি খেলতাম।

যেখানে যেতাম, মনটা শুধু নানির কাছে পড়ে থাকতো। এক রাতও কোথাও কাটাতে পারতাম না। নানির মমতা পাওয়ার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো। সময় কারো জন্য বসে থাকে না। এসএসসি পরীক্ষা চলে এলো। নানার প্রচেষ্টায় মাত্র বোর্ড ফি দিয়ে ফরম ফিলআপ করলাম। পরীক্ষা দিলাম। তিন মাস পর রেজাল্ট হলো। দুই মামা, ভাগিনা কয়েকটা লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিশন পেলাম।

খবর শুনে মা, নানি সবাই আনন্দে আত্মহারা। তবে ভাই ও ভাবী সন্তুষ্ট হননি। কারণ, এখন আবার প্রতিবেশী সবাই ধরবে কলেজে ভর্তি করানোর জন্য।

মাস খানেক পরে বললাম, ভাই, কোন কলেজে ভর্তি হবো।

আমাকে অপ্রস্তুত করে ভাই বললেন আমি তোকে আর পড়াতে পারবো না।

নানিকে গিয়ে বললাম নানি, ভাই এ কথা বলে দিয়েছে। নানি বললেন চিন্তা করিস না। আমি তো মরে যাইনি।

নানির প্রচেষ্টায় কলেজে ভর্তি হলাম। বাড়ি থেকে কলেজ অনেক দূরে। তাই পাশাপাশি একটা লজিং নিলাম। পড়ালেখা মন দিতে পারি না, শুধু নানির কথা মনে পড়ে। টাকা ফুরিয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে মায়ের ডিম বেচা টাকা ও নানির কাছ থেকে টাকা এবং এক গাট্টি উপদেশ নিয়ে নিয়ে চলে আসি লজিংয়ে।

এরই মাঝে আমার একটা কঠিন রোগ হলো। মাকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে বলিয়েছিলাম। ভাই বললেন মরে যাক, তাতে আমার কি! আমি কোনো টাকা দিতে পারবো না। যদিও ভাইয়ের কাছে তখন প্রচুর টাকা ছিল।

মা কান্নাকাটি করে নানিকে বললেন। নানি আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল।

অনেক দিন ওষুধ খেয়ে সুস্থতা বোধ করলাম।

এরই মাঝে এইচএসসি পরীক্ষা চলে এলো। ফরম ফিলআপ করে পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট, এক বিষয়ে ফেল।

নানি চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। বললেন তোকে আবার পরীক্ষা দেয়াবো।

যদিও আমার মন চাইছে না তবুও নানির কথায় পরীক্ষা দিলাম। কারণ, সব কিছু তো নানিই বহন করছেন। তাছাড়া পরীক্ষা না দিলে নানি মনে কষ্ট পাবেন।

আবার ফেল করলাম। নানিকে বললাম। নানি আমি শহরে চলে যাবো।

নানি বললেন কোথায় যাবি।

বললাম, চট্টগ্রাম।

বললেন কার কাছে। কেন ওইখানে তো আমাদের গ্রামের অনেকেই আছে। এবং ভালো চাকরিজীবী। তাদেরকে ধরে একটা ফার্মে ঢুকে যাবো।

এ কথা শুনে নানি খুব দুঃখ পেলেন এবং আমার অজান্তে কাদলেন।

সন্তানকে হারিয়ে মায়ের অন্তরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, দেখলাম নানির মনে ততোটুকু ক্ষতের দাগ লেগে গেল। বুঝলাম এটাকেই বলে স্নেহের বন্ধন। দুদিন পর চলে আসার সময় নানি আমার হাতে দুই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, ধর, টাকাটা রাখ। ভালোমতো চলাফেরা করিস। রীতিমতো খাওয়া–দাওয়া করিস আর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিবি। চিঠি দিয়ে খবর জানাবি ইত্যাদি।

মা ও নানির কান্না ভেজা মুখ দেখে চলে এলাম শহরে। এসে দেশের মানুষের প্রচেষ্টায় কয়েকটা টিউশনি ও একটা লজিং পেয়ে গেলাম।

কিন্তু যেদিকে তাকাই শুধু নানীর ছবিটাই ভেসে ওঠে। আর মনের অজান্তে নীরবে বসে কাদি। বছরখানেক পর একটা ফার্মে একটা চাকরিও পেয়ে যাই। আর এদিকে বাড়ির খবর শুনতে পাই, মা ও নানি আমার জন্য সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত।

জীবনে কতো আশা ছিল! যদি কোনো কর্ম করতে পারি মা ও নানিকে কতো কিছু দেবো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, মাকে অনেক কিছু দিতে পারলেও নানিকে এ পর্যন্ত একটা লজেন্সও দিতে পারিনি। যদি আকার–ইঙ্গিতে বোঝাতে চাই যে, নানি আমি আপনাকে কিছু দিতে পারি না।

তখন নানি বোঝেন এবং বলে, আমাকে কিছু দিতে হবে না। তোর মাকে দিস।

আল্লাহ আমাকে সব কিছু দিয়েছে।

তখন নানি বললেন বোকা, জানিস না, পাওয়াতে কোনো আনন্দ নেই। দেয়াতেই আনন্দ।

ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।
হঠাৎ নানি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি যদি তোর কাছে কোনো কিছু চাই, তুই কি দিবি?
বললাম, নানি এভাবে বলছেন কেন। আমার প্রতি কি আপনার কোনো অধিকার নেই।
বললেন, ভাইরে আমি যা চাইবো তা কখনো অধিকার খাটিয়ে আদায় করা যায় না।
চেয়ে দেখেন না।
তুই কি আমাকে সারা জীবন এভাবে সম্মান ও ভালোবাসা দিবি?
শতকরা নিরানব্বই ভাগ দেবো।
শতকরা এক ভাগ কার জন্য?
আমার ঘরণীর জন্য।
নানি বললেন, আমি কি তোর কাছে বৌয়ের ভালোবাসা চাইছি?
সবাই হেসে ফেললাম।
নানি বললেন ভুলে যাবি না তো।
তখন বুক ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, নানি আপনাকে যেদিন ভুলে যাবো সেদিন মা তার সন্তানকে ভালোবাসবে না, পাখি খাবার নিয়ে নীড়ে ফিরবে না, প্রকৃতির নিয়মে বসন্ত আসবে না, গাছে গাছে নতুন ফুল ফুটবে না, পাখি গান করবে না। সেদিন পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য উদিত হবে। তবে এসব কিছু বলি না। আমার নীরব মুখের ভাষা ও চোখের জল বলে দেয় নানিকে কতোটুকু ভালোবাসবো।
এখন যদি চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে যাই তাহলে নানি জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ে করবো কি না।
তখন মনের মধ্যে এক ধরনের ভয় ও আশঙ্কা এসে ভিড় করে। কারণ, আমার হৃদয়ে যা ভালোবাসা ছিল সবই তো আমার নানি মাকে উজাড় করে দিয়েছি। তাছাড়া নুরুভাইয়ের মতো চিরকুমার তো থাকতে পারবো না। কিন্তু বিয়ে করে বৌকে তো নানির মতো করে ভালোবাসতে পারবো না। তখন যদি আমার সংসারে নেমে আসে দুঃখের কালো ছায়া।
তবুও আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আমার নানিমাকে সমান ভালোবেসে যাবো। বিধাতার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, যেদিন নানির প্রতি আমার সম্মান ও ভালোবাসা বিন্দু পরিমাণ কমতি দেখা দেয় সেদিন যেন আমার জীবনের শেষ দিন হয়।

চান্দিনা, কুমিল্লা থেকে

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা

– মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বাবুল

আমার দ্বিতীয় সন্তান অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। কি চমৎকার মিষ্টি, মায়াবী হাসি। কোলে ওঠার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমিও হাত বাড়িয়ে দিয়েছি! দেখি সে কতো দূর আসতে পারে।
আমার কাছাকাছি এসে যেই আমার হাত ছুই ছুই ঠিক তখনই বাইরের কোনো একটি শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মুহূর্তেই আলোর সঙ্গে মিশে গেল আমার সন্তানের মুখখানি। ইশ! একটু কোলে তুলে আদরও করতে পারলাম না। হোক সেটা স্বপ্ন! বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাহাকার করে উঠলো। একটা সূক্ষ্ম বেদনায় ছেয়ে গেল মনটা।

মা ও শিশু দুজনেরই ভীষণ বিপদের আশংকা ছিল তার জন্মের সময়। অনেক বিপদ–আপদ কাটিয়ে জন্ম হয়েছে তার। জন্মের পর থেকেই ছেলেটা অসুস্থ থাকছে বেশির ভাগ সময়। কিছুদিন থেকে প্রচণ্ড শ্বাস কষ্টে ভুগছে। ডাক্তার নাকের ভেতরে পাইপ ঢুকিয়ে কফ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। আর আমার ছেলে চিৎকার দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উহ্! এসব দৃশ্য চোখের সামনে যখন ভেসে ওঠে তখন আমার ভীষণ কষ্ট হয়।

মন থেকে এই আঠালো ভাবনাটা দূর করার জন্য জানালা খুলে একটি সিগারেট ধরালাম। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কেবল সূর্য উঠছে। তখনো কুয়াশা দূর হয়নি। ঝরে পড়েনি গাছের পাতার শিশির বিন্দু। আমার ব্যালকনিতে টবে লাগানো বেলি ফুল গাছটির ফুলের সুঘ্রাণ আমার ভেতরে একটি শীতল শিহরণ জাগিয়ে দিল। সূর্যের আলোক চ্ছটায় উচু–নিচু দালানগুলো বড়ই বিচিত্র লাগছে আমার কাছে। কি পরম মমতায় একই মাটির বুকে সারি বেধে দাড়িয়ে আছে এরা নিবিড় মিলনে, আত্মীয়তার বাধনে মিলে মিশে একাকার হয়ে। এদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই, নেই কোনো কলহ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চোখ ধাধিয়ে যায় আমার। আপন মনেই বলে উঠি, এতো সুন্দর দৃশ্য। কখনোই তো দেখা হয়নি! আসলে প্রতিদিনই দেখি। কিন্তু এমন করে ভাবা হয় না।

বাচ্চার কান্নার শব্দে আমার প্রকৃতির সৌন্দর্যের মগ্নতায় ডুবে থাকায় ছেদ পড়লো। মুহূর্তেই ভাবনাগুলো উধাও হয়ে গেল। গভীর মমতায় বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলাম। তখনো বাচ্চার মা ঘুমিয়ে ছিল। আধুনিক যুগের বাবা হিসেবে ভেবেছি একটা সন্তান যথেষ্ট। দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তার জন্মের পর বুঝতে পেরেছি আমার হৃদয়ে দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হওয়ার কতোখানি আকুতি ছিল। ইশ! তার জন্ম না হলে আমি সীমাহীন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। বঞ্চিত হতাম তার চমৎকার মায়াবী হাসিমাখা মুখ দেখা থেকে।

সত্যিই দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হওয়ার অনুভূতি সম্পূর্ণই ভিন্ন রকম যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু অনুভবেই উপলব্ধি করা যায়। তার জন্য যে আমার হৃদয়ে এতো মায়া–মমতা, ভালোবাসা লুকানো ছিল তা কোনোদিনও জানা হতো না। মহান আল্লাহ আমাকে এতো কিছু বুঝতে দিয়েছেন বলে তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

আমার ছেলে কয়েক মাসের শিশু হলেও বুঝতে পারে আমিই তার বাবা। বাইরে থেকে ঘরে এলেই আমার সন্তানরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। এদেরকে নিয়ে মাঝে মধ্যে এক ভাবনায় ডুবে যাই।

এই যে এরা যখন অনেক বড় হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে নিজেদের জীবনে, প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে, সেটলড হবে কোনো উন্নত মহাদেশে তখন কি আমাদের চমকে দেবে কোনো এক ভালোবাসা দিবসে অথবা অন্য কোনোদিনে চকলেট, কেক বা কার্ড পাঠিয়ে! এসব রহস্যময় ভাবনার জট খুলতে হিমশিম খাই। সব দৃশ্যই কেমন যেন অদৃশ্যের আড়ালে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন আমার সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে আপন মনে হেসে উঠি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

হাঞ্চব্যাক অফ কুষ্টিয়া

– আবদুল্লাহ আল আমিন জয়

মেয়েটার প্রতি আমার উন্মাদ ভালোবাসা ছিল। টানা তিন বছর মেয়েটার হৃদয় হরণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনোভাবে মেয়েটার হৃদয় হরণ করতে পারিনি। উল্টো ওই মেয়ে তার দুই প্রেমিক সুহৃদয়ের সঙ্গে খুব মজা করে গল্প করতো।

রাক্ষসের প্রাণ থাকে ভোমরার মধ্যে আর আমার প্রাণ আছে ইরিনা–র মধ্যে। এ জন্য ইরিনার দুই সুহৃদয় সর্বদা আমার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতো। তাদের সব অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করেছি। কারণ, ভাবতাম দাণ্ডের হল বিয়াত্রিস। এবং আমার হলো ইরিনা।

কুষ্টিয়া ছোট শহর। হঠাৎ একদিন এ শহরের সবাই জেনে গেল। জার নামের একজন হতভাগা প্রেমিকের কথা। চোখের সামনে হয়ে গেলাম শহরের সর্বাধিক নন্দিত ছেলে।

ইরিনার ভালোবাসা পাইনি। কিন্তু পেয়েছিলাম পুরো কুষ্টিয়ার মানুষের ভালোবাসা। আর এটাই আমার জীবনের জন্য অভিশাপ হয়ে দাড়ালো। তৎক্ষণাৎ ইরিনার দুই সুহৃদয় রোকন ও বাবু। ইরিনা ও তার ক্ষমতাশালী আত্মীয়রা আমার ঘোর শত্রু হয়ে গেল। তারা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আমার নামে শহর জুড়ে বিচিত্র সব গুজব ছড়াতে লাগলো।

ইরিনার ভাই তপন ছিল শতকরা একশ ভাগ কৃমিনাল। তপন বলে বেড়াতে লাগলো, জয় টাকার জন্য আমার বোনকে ভালোবাসে।

তারা প্রতিনিয়ত আমাকে সমাজের কাছে হেয় করতে লাগলো। আমার নামে কেস করার হুমকি দিল। আমার পেছনে মাস্তান লেলিয়ে দিল। আমি প্রতি পদে পদে হোচট খেতে লাগলাম। আমি তাদের ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ–লালসা, পৈশাচিকতা দেখে হতবাক। রোকন, বাবু, তপন, ইরিনা ও তার ক্ষমতাশালী আত্মীয়দের কুটিল রাজনীতির শিকার হলাম। ইরিনা প্রেমের ইতিহাস বদলে দিল।

শৈশবে ভিক্টর হিউগো–র *হাঞ্চব্যাক অফ নটর ডেম* বইটি পড়ে কেদেছিলাম। সেই কোয়াসিমাদো চরিত্রটির জন্য।

একদিন এক চমৎকার সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। এবং দেখলাম কোয়াসিমাদো হয়ে গিয়েছি। শতকরা একশ ভাগ কোয়াসিমাদো। আমি রাস্তায় বের হলে কেউ আমাকে খোচায়, অপমানিত করে। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, মজা করে। কেউ বা *দেবদাস, পাগল* বলে চিৎকার দেয়।

এ জন্য দুঃখ, লজ্জা, অপমানে বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং কুষ্টিয়া ছেড়ে যাবার প্ল্যান করলাম।

কালিশংকরপুর, কুষ্টিয়া থেকে

নিমন্ত্রণ

– সাঈম চৌধুরী

রিতুকে আমরা চারজনই ভালোবাসতাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ভালোবাসার বিষয়টি কেউ কাউকে কখনো গোপন করিনি অথবা এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়ার চেষ্টা করিনি। অথচ আমরা চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। চারজনের এক এলাকায় বসবাস। সম্ভবত একই সময়ে আমরা একযোগে রিতুর প্রেমে পড়ি।

রিতুরাও আমাদের এলাকায় থাকে। থাকে বলতে হঠাৎ একদিন ইউসুফচাচার বাসা কিনে নিয়ে তারা বসবাস শুরু করে। আমাদের তখন উঠতি বয়স। চলনে–বলনে বড়ত্ব ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। বয়সে যারা একটু ছোট তাদের সিগারেট ফুকতে দেখলে মানসম্মান সব চলে যাবে ভেবে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নেয়া। তারা মান্য করলো কি না সেটা বিবেচ্য ছিল না। সেই সময়ে মনের ভেতরে কেমন যেন উথাল–পাতাল ভাব। চার বন্ধু এক সঙ্গে সারা দিন তুমুল আড্ডায় কাটিয়ে দিই। সেই আড্ডার ভেতরে কোথায় জানি শূন্যতা। কি যেন নেই, কি যেন নেই এমন পাগল করা অনুভূতি। সেই অদ্ভুত সময়ে রিতুর সঙ্গে দেখা।

এক বিকেলে নিজের বাসার গেটের সামনে দাড়িয়েছিল সে। আশ্চর্য সুন্দর মেয়ে, একবার তাকে দেখলে আরো একশবার পেছনে ফিরে দেখে নিতে ইচ্ছা হয়। এক বিকেলে তাকে দেখে আমরা চারজন যেন নিজের আপন ঠিকানার সন্ধান পাই। এই তো এখানেই আমার না থাকার অনুভূতির ইতি।

রিতুর সঙ্গে প্রেম করতে হবে সিদ্ধান্তটা প্রথম জানায় সবুজ। সে কেবল তার নিজের কথাই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তে এটা আমার, বাদল আর রাতুলেরও সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।

বাদল বলে, এটা সে আরো আগেই বলতো।

রাতুল জানায়, প্রথম দিন রিতুকে দেখার পর থেকেই সে রিতুর প্রেমে পড়ে গেছে।

আর আমি এক বাক্য জানাই, রিতুকে আমার চাই-ই চাই।

রিতুকে নিজের করে নেয়ার এই বিপুল প্রতিযোগিতায় আমরা কেউ কারো প্রতিযোগী হয়ে উঠি না। বরং আশ্চর্য রকমভাবে একে অন্যের প্রতি সহমর্মী হয়ে উঠি। এই বিপরীতধর্মী অনুভূতি কিভাবে আমাদের মনের মাঝে জন্ম নিয়েছিল সেই রহস্য আজও ভেদ করা সম্ভব হয়নি।

খোকনের চা স্টলে বসে আমরা রিতুর ব্যাপারে কথা বলতাম। মাঝে মধ্যে তাকে দেখতে ইচ্ছা হলে কারো একজনের প্রস্তাবে রিতুর বাসার গেটের সামনে গিয়ে দাড়িয়ে পড়তাম। কখনো খুব সৌভাগ্য হলে তার সঙ্গে দেখা হতো, না হলে প্রায় দিন দাড়িয়ে থাকা সার। এই রকম করে আমরা আরো ব্যাকুল হই। কিন্তু তার সঙ্গে কথা হয় না। সে গাড়িতে করে প্রতিদিন স্কুলে যায়। আমরা জানি সেই সত্য। গাড়ির কালো গ্লাস ভেদ করে তাকে দেখতে পারার সুযোগ হয়ে ওঠে না।

সেই সময় একবার কথা উঠেছিল, গাড়িতে কালো গ্লাস ব্যবহার করা যাবে না। এই ঘোষণায় চার সদস্য তরুণের কি আনন্দ! গাড়ির গ্লাস শাদা হলে দেখা হবে প্রতিদিন।

আমাদের তখন দেখেই কেবল সুখ। বলার সাহস আর হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এক সঙ্গে চারজনের প্রেমের প্রস্তাব দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা বুঝতে পারি এটা অসম্ভব। তাই একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাই। এবারও প্রস্তাব তোলে সবুজ। সেই ছিল সম্ভবত সবচেয়ে সিরিয়াস প্রেমিক।

তার প্রস্তাবে আমরা ভাবতে বসি কি করা যায়!

বাদল বলে, চারজন এক সঙ্গে গিয়ে বলতে পারি আমরা তোমাকে ভালোবাসি, যাকে ভালো লাগে বেছে নাও। সে যাকে বেছে নেবে, আমরাও তাকে মেনে নিয়ে সাহায্য করবো।

বাদলের এমন প্রস্তাবে আমরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাই। আমাদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর তরুণটি সে। প্রস্তাবটা যদি সত্যি সত্যি দেয়া যায় তবে তারই জয়ের সম্ভাবনা। অবশ্য টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে রাতুল। আমি আর সবুজ এ দুই ব্যাপারে পিছিয়ে আছি। তাই তার প্রস্তাবে আপত্তি।

সবুজ বলে, তারচেয়ে বরং লটারি হোক। যার নাম উঠবে, আমরা তার জন্য কাজ করবো।

এই প্রস্তাবটাও গ্রহণযোগ্য হয় না। শেষে সেই প্রথম স্থানে, আমরা চারজনই লেগে থাকবো। এর মাঝে রিতু যাকে বেছে নেবে তাকেই জয়ী মেনে নিয়ে অন্যরা সরে যাবো।

এই সিদ্ধান্তে আমি ও সবুজ খানিকটা পিছিয়ে পড়ি। কিন্তু হাল ছেড়ে দিই না। প্রেম তো আর অংক নয়, সূত্র মতোই ফলাফল। মাঝে মধ্যে তো ওলোট-পালোটও ঘটে। আমরা এই রকমের ওলোট-পালোটের অপেক্ষা করি।

যার জন্য এতো সব ব্যাপার-স্যাপার সে আদৌ কিছু বোঝে কি না সেটা আমাদের বোঝা হয় না। সে আমাদের চারজনকেই তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে দেখে। মাঝে মধ্যে তার মুড খুব ভালো থাকলে সেও হালকা পরিচিতের হাসি উপহার দেয়। তাতেই আমরা বর্তে যাই। অবশ্য গবেষণাও হয়। কার দিকে তাকিয়ে তার এমন মোহময় হাসি!

এর মাঝে একদিন রাতুল কিভাবে জানি জেনে নেয় রিতুর জন্ম তারিখটা। সেটা সে আমাদেরও জানায়। আমরা উত্তেজিত হই। যেভাবেই হোক, জন্মদিনে তাকে কিছু একটা গিফট দেবো। রাতুল জানায়, সে দেবে বিদেশি একটা হারমোনিকা। সেটা তার মামা আমেরিকা থেকে তার জন্য নিয়ে এসেছেন।

তার এই ঘোষণায় আমরা চুপসে যাই। এতো দামি গিফট উপহার দেয়ার সাধ্য আর কারো ছিল না।

বাদল বলে, না, একটা হবে না। যা দেয়ার চারজনে মিলে এক সঙ্গে দেবো। কেউ ফুল আর হারমোনিকা এটা মেনে নেয়া যায় না।

আমরা বাকি দুজন তার কথায় তাল দিই। তিনজনের প্রস্তাবে পাস হয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু কি দেয়া যায়! সবচেয়ে বড় কথা হলো, কিভাবেই বা দেয়া যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, রিতুর সঙ্গে আমাদের কোনো আলাপ হয়নি। সেই অর্থে আমরা অপরিচিত। অপরিচিতজনের উপহার সে নেবে এমন গ্যারান্টি কোথায়!

আমরা ভাবতে বসি। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত একটা পরিকল্পনা মাথায় আসে। গিফট আমরা হাতে দেবো না। গিফট ঝুলিয়ে দেবো। ওই বয়সে এ রকম একটা পরিকল্পনা কিভাবে নেয়া সম্ভব হয়েছিল জানি না। কিন্তু পরিকল্পনাটা সবার পছন্দ হয়।

পরিকল্পনা মতো রিতুর জন্মদিনের পূর্ব রাতে আমরা চারজন তার বাসার গেটের সামনে একটা ব্যানার ঝুলিয়ে দিই। রংধনু আর্ট সেন্টার থেকে রীতিমতো পঞ্চাশ টাকা খরচ করে তিনগজের এক ব্যানার। গভীর রাতে আমরাই ঘরের সবার চোখ ফাকি দিয়ে এসে ব্যানারটা ঝুলিয়ে দিয়ে যার যার বাড়িতে চুপিসারে ফিরে যাই।

পরদিন জানা হয় রাতের অন্ধকারে উল্টোভাবে ঝুলানো হয়েছে ব্যানার। সেটা পড়তে হলে চোখের বিশেষ কায়দায় পড়তে হবে।

উল্টোতেই হুলস্থুল। রিতুর বাবা মহা ক্ষেপা। হারামজাদারা আমার মেয়েকে কি দোকান পেয়েছে। ভদ্রলোক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিষয়টা দেখে দেয়ার অনুরোধ করেন।

মুরুব্বিরাও বলেন, বেয়াদব। ছেলেপুলে, তাদের কানে ধরে উঠ–বস করানো দরকার।

অথচ ব্যানারে তেমন দোষণীয় কিছু লেখা ছিল না। শুধু লেখা, *শুভ জন্মদিন রিতু।*

কারো কোনো নাম নেই। অবশ্য রংধনুর আর্টিস্ট ছেলেটা ব্যানারে লাল একটা হৃদয় একে দিয়েছে। ব্যাটা দিবি যদি তাহলে চারটাই দে!

মুরুব্বিরা আমাদেরই সন্দেহ করেন। মুখে অবশ্য কিছু বলেন না। কিন্তু চলনে–বলনে সন্দেহের ব্যাপারটা গোপন থাকে না। তাই আমরা রিতুর বাসার গেটের সামনে দাড়াই না।

অথচ একদিন আমাদের দেখে ঠিকই দাড়িয়ে পড়ে রিতুর গাড়ি। গাড়ির ভেতর রিতু। সে হাত বাড়িয়ে ডাকে। আমরা চারজনে পরম উত্তেজনায় এক সঙ্গে গাড়ির কাছে ছুটে যেতে চাই।

সে তখন নির্দিষ্ট করে শুধু বাদলকেই যেতে বলে।

আমরা থমকে যাই। হায়! শেষ পর্যন্ত বাদল!

কোনো রকমে রাতুলকে জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগছে।

রাতুল কান্না আটকানো স্বরে বলে, খুব আনন্দ হচ্ছে। আমাদের এতো দিনের শ্রম সার্থক।

সবুজ অবশ্য রাখঢাক করে না। স্পষ্ট স্বরে বলে, বাদল শালাকে আজই খুন করে ফেলা উচিত।

ডেকে নিয়ে যাবার তিন মিনিটের ভেতর ফিরে আসে বাদল। তার চেহারা কালো আমরা তাতে ভরসা পাই।

সবুজ জানতে চায়, কিরে, কি বললো?

বাদল থতমত স্বরে বলে, সে বললো, ব্যানার যে আমরা ঝুলিয়েছি সেটা তার জানা আর যদি কখনো এমন কাণ্ড করি তাহলে সে আমাদের ধরে পুলিশে দেবে।

কি সর্বনাশ! অমন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করি কোন সাহসে!

এরপর থেকে আমাদের প্রেমে ভাটা আসে। আমাদের বয়স বাড়ে। চার বন্ধুতে অল্প বিস্তর দূরত্ব বাড়ে। মূলত এসএসসি পাস করার পর একেকজনের একেক কলেজে ভর্তি হওয়াতে একজন অন্যজন থেকে দূরে সরে যাই। সবারই পৃথক বন্ধু মহল গড়ে ওঠে।

তারপর এইচএসসি পাস। এবার ইউনিভার্সিটিতে। একেকজন একেক স্থানে ছড়িয়ে পড়া। কেউ চিটাগাং, কেউ শাহজালাল, কেউ এমসি কলেজ।

এখন আমাদের দেখা হয় হঠাৎ হঠাৎ। কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে রিতুর যেদিন গায়ে হলুদ সেদিন অজান্তেই আমরা এক হয়ে যাই। সেদিন পুরনো সেই সব কথা ওঠে। আমরা দীর্ঘশ্বাস গোপন করি।

হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে বাদল বলে, ওই যে একদিন রিতু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মনে আছে তাদের? সেদিন আমি তার কাছে থেকে ফিরে এসে হিংসা করে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। রিতু বলেছিল অন্য আরেকটা কথা।

আমরা বাকি তিনজন উৎসুক হই। এক সঙ্গে জানতে চাই, অন্য কথা মানে সেটা কি?

বাদল ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলে, রিতু বলেছিল, এই যে লাল শার্ট সে তো তোমার বন্ধু। তাকে বলো, আজ বিকেলে আমার গেটের কাছে যেন আসে একবার।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক হই। সেই সাত আট বছর আগে কার গায়ে ছিল লাল জামা? কে সে সৌভাগ্যবান মনে পড়ে না। আট বছর অনেক দীর্ঘ সময়।

রাতুল জানতে চায় লাল শার্ট, সে কে?

বাদল বলে, তোদের তিনজনের যে কেউ একজন, কে সে আর এখন জেনে কি লাভ?

আসলেই এখন কি লাভ? তারচেয়ে বরং এই ভাবা ভালো, সেদিন আমার গায়েই ছিল লাল জামা। এই ভেবে তৃপ্তি, হয়তো আমার কাছেই ছিল রিতুর নিমন্ত্রণ!

সিলেট থেকে

রুটিন

– জান্নাত হক

আয়নার সামনে দাড়িয়ে চুলে শেষবারের মতো চিরুনি বোলালো রুদ্র। এরপর নিজের চেহারাটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো কয়েকবার। নাহ! দেখতে খারাপ লাগছে না। চেহারা দেখা শেষ করেই ব্যাগটা কাধে ঝুলিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। ধুপধাপ করে দুই তিনটি সিড়ি একবারে টপকে নিচে নেমে ছুটলো গলির মোড়ে। পৌছেই ঘড়িতে সময় দেখলো। নাহ দেরি হয়ে যায়নি, সময় মতোই পৌছাতে পেরেছে। আর পাচ মিনিট পর সুমি সামনের রাস্তা দিয়ে কলেজে যাবে। কিন্তু পাচ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। দূর থেকে সুমিকে রিকশায় আসতে দেখেই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে নজর ফেরালো সে। সে যে সুমির জন্যই দাড়িয়েছিল সেটা সুমিকে বুঝতে দিতে চায় না। তাই অকারণে ঘড়ি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সময় দেখার ভান করে আড়চোখে তাকিয়ে থাকলো সুমির দিকে।

ইশ! রিকশাটা এতো তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন? দ্রুত রিকশা চালানোর জন্য মনে মনে কয়েকবার রিকশাচালককে গালি দিল সে। এরপর রওনা হলো নিজের পথে।

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে রাতে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলো সুমির কথা। আচ্ছা, সুমি কি বুঝতে পেরেছে তার জন্যই যে প্রতিদিন দাড়িয়ে থাকে রুদ্র। সে যে রকম ম্যাচিওরড মেয়ে তার তো না বোঝার কথা না! তাছাড়া

ব্যাপারটা তো আজকালকার না। রুদ্র অনেক দিন থেকেই সুমিকে ভালোবাসে। যদিও সে সরাসরি কখনো বলেনি সুমিকে। কিন্তু সে নানানভাবে সুমির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে।

ছোট বোনের স্কুল ফ্রেন্ড হওয়ার সুবাদে আগে প্রায়ই রুদ্রদের বাসায় সুমি আসতো। সুমির উপস্থিতি টের পেয়ে সে নিজের রুমে বসেই সুরেলা গলায় গান ধরতো। তার গানের গলা মিষ্টি। এ জন্য ছোট বেলা থেকেই অনেক পুরস্কার আর নানানজনের প্রশংসা পেয়েছে সে। সুমি বাসায় এলে রুদ্রের সঙ্গে তার নানান বিষয় নিয়ে কথা হতো। তবে রুদ্রর গানের প্রশংসা সে কখনো করেনি।

শুধু যে গানের গলা সুন্দর তা নয়, রুদ্র দেখতেও খুব সুন্দর আর মেধাবীও খুব। কিন্তু এতো গুণ থাকা সত্ত্বেও সে কোনোভাবেই সুমির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। এমন না যে, সুমি অন্য কাউকে ভালোবাসে। রুদ্র সব রকম খোজ–খবর নিয়ে দেখেছে। কারো সঙ্গে তার সে রকম কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কেন সে রুদ্রকে ভালোবাসতে পারছে না? আচ্ছা, এমনতো তো হতে পারে, রুদ্র যেমন সুমিকে ভালোবাসে, সুমিও তেমনি রুদ্রকে ভালোবাসে। কিন্তু কেউ কাউকে জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

যদি এ রকম হয় তবে তো রুদ্ররই উচিত সুমিকে তার ভালোবাসার কথা জানানো। কিন্তু রুদ্র তো সে রকম সাহসী নয়। তাছাড়া সুমি যদি তাকে না করে দেয় তবে ভীষণ কষ্ট পাবে সে। তার চেয়ে এই ভালো। সে একা একাই সুমিকে ভালোবেসে যাবে।

কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চলবে? সে তো সুমিকে তার ভালোবাসার কথা জানাতে চায়। সুমির ভালোবাসা পেতে চায়। না, যেভাবেই হোক সুমিকে কথাটা বলতেই হবে রুদ্রর। তাতে যা হয় হোক। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় রুদ্র। এরপর সুমি যেদিনই আসবে রুদ্রদের বাসায় সেদিনই সে টুক করে এক ফাকে সুমিকে জানিয়ে দেবে এতোদিন জমে থাকা তার মনের কথাটি। এতো সব চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার ছুট লাগায় রাস্তার মোড়ে। প্রতিদিন একই রুটিন। সুমির পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আজ সুমি আসছে হেটে হেটে। রিকশা পায়নি বোধহয়। যাক, ভালোই হয়েছে। অনেকক্ষণ দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে সুমি। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্য কিছু করার কথা মনে থাকলো না তার। যখন মনে হলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একেবারে কাছে চলে এসেছে সুমি। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা, কি ভাববে সুমি তাকে?

এখন আর কিছু করার উপায় নেই দেখে সুমির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

কি ব্যাপার? রিকশা পাওনি? হেটে আসছো যে? বললো রুদ্র।

প্রত্যুত্তরে সুমি একটু হেসে জবাব দিল, আজ তো রিকশার ধর্মঘট, আপনি জানেন না?

ও তাই নাকি! বলে রুদ্র।

হ্যা। আপনি প্রতিদিন এখানে দাড়িয়ে থাকেন কেন?

ইউনিভার্সিটির বাসের জন্য। জবাব দেয় রুদ্র।

আপনার বাস তো এদিক দিয়ে যায় না।

ও হ্যা, তাই তো। বলেই লজ্জা পেল সে।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায় সুমি। রুদ্র তার গমন পথের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। এমনিভাবেই কেটে যায় এক একটা দিন। কিন্তু মনের কথাটা বলা হয়ে ওঠে না।

এর মাস দুয়েক পরে একদিন কলিং বেল শুনে দরজা খুলে দেয় রুদ্র। দারোয়ান কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো ছোট একটি প্যাকেট তুলে দেয় তার হাতে।

চিন্তিত মুখে প্যাকেট খুলে ভীষণ বিস্ময় আর ভালোলাগায় ভরে ওঠে তার সমস্ত মন প্রাণ। অপরিসীম আনন্দে উদ্বেলিত হয় তার হৃদয়। তার জন্মদিনে সুমি তাকে উপহার দিয়েছে ছোট্ট একটি খাম যার ভেতর একটি চিরকুটে লেখা রয়েছে তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সুন্দরতম বাক্যটি :
আমি তোমাকে ভালোবাসি।

পূর্ব বাসাবো, ঢাকা থেকে

নির্বাচিত

– এ.এস.এম রহমাতুল্লাহ

আমার এক চাচাতো ভাই সেনাসদস্য। তিনি চাকরির কারণে ঢাকায় থাকতেন, ভাবী থাকতেন বাড়িতে। তখন সবেমাত্র শিক্ষার এক ধাপ পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি। ভাবী ছিলেন বয়সে আমার থেকে সাত বছরের বড় এবং সুন্দরী। তাকে দেখলে চোখ ফেরানো যেতো না। লম্বা, আকর্ষণীয় ফিগার, নরম দুটি ঠোট।
ভাবীর সঙ্গে প্রতিদিনই আড্ডা জমাতাম। ভাবী দুই সন্তানের জননী হলেও তাকে দেখে মনে হয় না তিনি জননী।
একদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ির পাশেই মধুমতি নদীর তীরে দাড়িয়ে আমরা বেশ কয়েকজন মিলে গল্প করছিলাম। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই টিভিতে *ইত্যাদি* অনুষ্ঠান দেখার জন্য একে একে সবাই বাড়ির মধ্যে চলে যায়। নদীর পাড়ে আমি আর ভাবী দাড়িয়ে নদীর সৌন্দর্য দেখছি। দুজন একদম নীরব কোনো কথা নেই মুখে।
হঠাৎ ভাবী বলে উঠলেন দেখো, চাদের আলোতে নদীর পানি কেমন সুন্দর লাগছে।
সুযোগ পেয়ে বললাম, তারচেয়েও সুন্দর লাগছে আপনাকে।
ভাবী অবাক চোখে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, আমি সুন্দর না ছাই!
বললাম, আপনি কোনো মানবী নন, আপনি স্বর্গের অপ্সরী! সৃষ্টিকর্তা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন।
এ কথা শুনে ভাবী লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। আমি তার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?
কবি নজরুলের ভাষায় বললাম, *তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?*
ঠোটের ছলকানিতে ভড়কে গেলাম। ভয় করছে। কাপছি আমি। এরপরও সাহস করে তার উন্মুক্ত মসৃণ পেটে হাত দিলাম।
তিনি একটুও সরলেন না।, প্রতিবাদও করলেন না।
শুধু বললেন, কেউ দেখে ফেলবে।
বললাম, এখানে আর কেউ আসবে না।
পরে তার উরুতে হাত দিলাম।
তিনি বললেন, ছাড়ো, তারপরেই দৌড়ে চলে গেলেন বাড়ির ভেতর।
আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম। সে রাতে আমার আর ঘুম হলো না। শুধু ভাবীর কথা ভেবেই সময় চলে গেল।
পরের দিন বিকেলে ভাবী বললেন, কি ব্যাপার, তোমার চোখ লাল কেন? রাত জেগে বুঝি প্রেমিকার কাছে চিঠি লিখেছো?
আমি কোনো উত্তরই দিতে পারলাম না।
ভাবী বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আজ রাত এগারোটায় আমার ঘরে এসো।

আমার তখন যে কি ভালো লাগছিল তা বোঝাতে পারবো না। শুধু সময়ের অপেক্ষা করছি কখন বাজবে এগারোটা। সেদিন বাড়িতে চাচা না থাকায় ভেতরে কোনো ভয় কাজ করছিল না।

সে রাতে দরজা খুলে ভাবীর ঘরে ঢুকতেই দেখি ভাবী নীল রঙ–এর শাড়ি পরে দাড়িয়ে আছেন। ঠোটে মৃদু হাসির রেখা। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। জাপটে ধরলাম ভাবীকে। তার ওই নরম দুটি ঠোটে চুমু খেলাম। আমার জীবনে কোনো মেয়েকে এই প্রথম চুমু। ভাবীও আমার ঠোট দুটি চুষে লাল বানিয়ে দিলেন।

ভাবী বললেন, আচ্ছা, তুমি সত্যি করে বলো তো তুমি আমার কাছে কি চাও?

আমি তোমাকে চাই।

আমার কতোটুকু চাও?

তোমার সবটুকু চাই।

সবটুকু পেতে হলে যে সবটুকু দিতে হয় তা কি জানো?

আমি তো তোমাকে আমার সবটুকু উজাড় করে দিতে চাই ভাবী। কিন্তু তোমাকে তো আমি পাই না।

কখনো চেয়েছো তুমি আমাকে? নারীরা কি সব কথা মুখে বলতে পারে? বুঝে নিতে হয়। তোমাকে আমি এই মুহূর্তে একান্ত আপন করে পেতে চাই।

সত্যি বলছো ভাবী? এ যে আমার শত জনমের পাওয়া।

ভাবী আমাকে প্রচণ্ডভাবে জড়িয়ে ধরলো।

ফিশফিশ করে বললাম, ঘরে আর কে আছে?

শুধু বাচ্চারা।

ভাবী আমাকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল। বললো, আজ আমাকে শেষ করে দাও।

কোনো নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক এই প্রথম। তাই কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে তার মুখে, বুকে এলোপাথাড়িভাবে চুমু খেতে লাগলাম।

ভাবী আমাকে প্রচণ্ডভাবে জড়িয়ে ধরলেন তার বুকের সঙ্গে। ভাবী আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তারপর আমরা দুজনেই হারিয়ে গেলাম স্বর্গের এক নাম্বার ফ্ল্যাটে। সেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

অসীম আনন্দের মাঝে বিচরণ করে এক পর্যায়ে ফিরে আসি পৃথিবীর বাস্তবতায়। যখন ফিরে আসি তখন আমরা দুজনই ক্লান্ত, সারা শরীর শুধু ঘামছে।

সকাল হতেই ভাবী আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় সর্বাঙ্গে চুমু খেতে লাগলেন এবং বললেন, তুমি আমাকে কাল রাতে যে তৃপ্তি দিয়েছো তা জীবনে কোনোদিনই পাইনি। তুমি খুব লাজুক প্রকৃতির। মেয়েমানুষ দেখলেই মাথা নিচু করে ফেলো। এ জন্যই তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমাকে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসি। কিন্তু কখনো তা তুমি বুঝতে চাওনি। তোমাকে জীবনে কোনোদিন ভুলবো না। তুমি আমাকে কথা দাও, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

সেই সকালে কথা দিয়েছিলাম কখনো ভুলে যাবো না। ভাবীর কাছ থেকে একদিন জানতে পারলাম, আমার চাচাতো ভাইটি অক্ষম। তাই ভাবী বিকল্প হিসেবে আমাকেই বেছে নিয়েছেন। ভাবী অবশ্য মাঝে মধ্যে বলতেন, চলো আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলি। কিন্তু আমার পক্ষে যে তা সম্ভব নয়! আমি তার নির্বাচিত পুরুষ। কিন্তু একটা পরিবারকে এভাবে ধ্বংস করার কোনো অধিকারই আমার নেই। তাছাড়া সামাজিকভাবে এলাকায় চলাটাও হবে কঠিন। তাই অনেক বুঝিয়ে ভাবীকে ঠাণ্ডা করেছি।

ফরিদপুর থেকে

ভুলতে চাই

– লাবনি

আমি ভুলতে চাই। ভুলে যেতে চাই আমার সম্পূর্ণ অতীতকে। কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? যায় না। ভোলা যায় না। কারণ তুমি তা চাও না। তুমি আমাকে ঠিক মনেও করো না। অথচ আমি তোমাকে ভুলে থাকি তা তুমি সহ্য করতে পারো না।

তুমি কি সেই দিনগুলোর কথা মনে করতে পারো যে দিনগুলোতে ছিলাম দারুণ উজ্জ্বল, উচ্ছল আর স্বাচ্ছন্দ বোধ করতাম শুধু তোমারই সঙ্গে। সে সময় আমার মনে হতো, তুমি আমাকে কি ভীষণ ভালোবাসো। শুধু আমার জন্যই করতে পারো অনেক কিছু। এমনকি আমাকে নিয়ে দেশান্তরী হতেও তুমি পারো। আমার একটুখানি উষ্ণতা পাবার জন্য তুমি আকুল হয়ে থাকতে সারাক্ষণ।

কি ভীষণ বোকা ছিলাম! তোমার এসবকে একবারও মিথ্যা ভাবিনি। একবারও অসম্মান করতে ইচ্ছা হয়নি আমার। আমূল পরিবর্তন এনেছিলে তুমি আমার সর্বাংশে। তোমার জন্য আমার প্রিয়জনদেরও ভুল বুঝতে শুরু করেছিলাম। আজ ভাবি, কেন একবারও তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখিনি? কেন অন্যদের মতো ভাবতে বসিনি যে, তুমি আমার কাছেও মিথ্যা বলতে পারো? অথচ তুমি দিনের পর দিন আমাকে মিথ্যা বলেছো। গোপন করেছো অনেক কিছু। সেই সঙ্গে শোষণ করে নিয়েছো আমার সমস্ত মেধাশক্তিকে। নির্বোধ ছিলাম বলেই একবারও অনুভব করিনি তোমার নিদারুণ ওই প্রতারণাকে।

আমি ভালোবেসেছি শুধু ভালোই বেসে গেছি। অন্য কিছু দেখার কিংবা ভাবার ইচ্ছা হয়নি আমার। আজ বুঝি, আমার এই ভালোবাসা নামের জিনিসটির সুযোগ নিয়েছিলে তুমি। যখন আমাদের মধ্যে স্থানের দূরত্ব বাড়লো তখন একবারও ভাবিনি যে, আমাদের মনের দূরত্বও বেড়ে গেল। আমি চোখের আড়াল হতেই তুমি আমাকে মনেরও আড়াল করলে। অন্যের মাঝে খুজতে চেয়েছো দ্বিতীয় আমাকে। আমি খুজিনি তোমাকে অন্যের মাঝে। আমার কাছে তুমি তো তুমিই। তুলনাহীন একজন।

খুজতে খুজতে পেয়েও গেলে একজনকে। তার সঙ্গেও তুমি প্রতারণাই করতে চেয়েছিলে, ঠিক জড়াতে চাওনি। কিন্তু সবাই তো আর আমি নয় যে, তোমাকে ছেড়ে দেবে। বাধ্য হয়েই গ্রহণ করলে তাকে তোমার জীবনে। অথচ আমার কাছে আবদার ধরলে কিছুতেই আমি যেন আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট না করি। তোমার ওই নোংরা আবদারকে দুই পায়ে ঠেলেছি। তোমার জন্য যতো না ঘৃণা হয়েছে তারচেয়ে বেশি মায়া হয়েছে ওই মেয়েটির জন্য যে তোমার জন্য নিজের জীবন নষ্ট করলো। আমি চাইনি সে আর কোনো কষ্ট পাক।

ভালোবাসি বলেই তোমাকে অনেক ব্যাপারে অনেক ছাড় দিতে গিয়ে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবুও আশা ছিল, হয়তো তুমি একদিন আমার জন্যই ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারো। কিন্তু নিজেকে তুমি নিয়ে গেছ নোংরা অন্ধ গলিতে। আমার জীবনে একজন আলোকিত মানুষ চেয়েছিলাম। তুমি তো নিজেকে সপেছো অন্ধকারে। কি করে তোমাকে আর গ্রহণ করি বলো?

তুমি ওই মেয়েকেও ধরে রাখতে পারোনি। হয়তো মেলাতে চেয়েছো আমার সঙ্গে এবং প্রতিটি ব্যাপারেই দারুণ অমিল খুজে পেয়েছো। তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছো আমার আশায়।

কি অদ্ভুত ভাবনা তোমার? আমি আজও তোমার জন্যই বসে আছি! আমি যেমন তোমার জন্য অপেক্ষা করি না তেমন অন্য কাউকেও আর এভাবে অনুভব করি না। তুমি যোজন মাইল দূর থেকে জানতে চাও আমি কেমন আছি। একটু কথা বলে একটু শান্তি পেতে চাও। কিন্তু আমার ইচ্ছা করে না ওই একটু কথা বলে তোমাকে একটু শান্তি দিতে। তুমি কোনো অশান্তিতে থাকো এটা কখনো চাই না।

তুমি আমাকে ভুলে যাও তা চাই। আমি আমার জীবনে শান্তি চাই। বোধহয় তুমি চাও না যে, আমি একটু শান্তিতে, একটু ভালো থাকি। হয়তো চাও না যে, আমি তোমার মতো করেই কাউকে অনুভব করি। তোমাকে যেমন ঠিক ঘৃণা করতে পারি না তেমনি তোমাকে আর আগের মতো অনুভবও করি না। ভুলে যাইনি কিছুই মনেও করতে চাই না সেদিনগুলোকে। সেসব মনে করে আমার কষ্টময় জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলতে চাই না।

এখন আর সেই ষোল বছরের কিশোরীটি নেই যে, তোমার ধার করা, চুরি করা কবিতা এবং চটুল মিথ্যা ভাষণ শুনে আবেগের অথৈ জলে ভাসবো। এখন নিজের ভালো সবটা না বুঝলেও অনেকটা বুঝি। এটুকু বুঝি যে, আমাকে ভুলতে পারলেও আমার বাবার অগাধ টাকাকে ভুলতে পারো না। সেদিন তুমি জানতে চাইলে পড়াশোনা শেষে আমি কি করবো? উত্তর দিইনি।

আজ বলছি, আমি আর যাই করি না কেন, অন্তত কারো ক্ষতির কারণ হবো না। তোমার মতো অন্য কারো দয়া ভিক্ষা করবো না। আজ তোমাকে ভালোবাসি না, ঘৃণাও করি না। শুধু করুণা করতে ভীষণ ইচ্ছা হয় আমার।

চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

উৎসর্গ

– মেহেদী রায়

সবকিছু পেতে হলে কি চাওয়া লাগে?

তা তো লাগবে। না হলে বুঝবো কিভাবে!

তোমার হাতটা ধরতে খুব ইচ্ছে করছে। একটু ধরি?

হাসতে হাসতে বললো, হাত ধরতে বলতে লাগে না।

সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

নীরবে ধরলাম। এক বুক আবেগ নিয়ে বলেছিলাম, আমার জীবনের একটি স্বপ্ন পূরণ হলো।

সে জানতো আমার জীবনের কাছে চাওয়া এতোই কম যে, তা অবিশ্বাস্য। একটা হাত ধরে একজন এতোটা খুশি হতে পারে সে যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত লেকের পাড়ে বসেছিলাম। একটু দূরের প্রেমিক যুগলের চুমু দিতে দেখে ওকে দেখতে বললে, ও আমাকে শিখতে বলেছিল।

খুব ইচ্ছা ছিল ওর তপ্ত ললাটে একবার চুমু দেয়ার। শুধু কবিতাতে পড়েই গেলাম, *ললাট হয় তপ্ত,* সেখানে অধর স্পর্শ করলে হয় তৃপ্ত। হয়নি!

সেদিনই খুব কাছাকাছি বসে ওর হাতটা ধরি।

মৃদু বাতাস আর ছোট ছোট ঢেউয়ের গান শুনছিলাম। কিন্তু এতোটুকু সাহস আমার হয়নি, ওর কপাল ও অধরে চুমুর চিহ্ন একে দিই। তাকে স্পর্শ করি।

এমনি খানিকটা সময় পেরিয়ে গেছে পথ চলে চলে, কিছু গল্প, একটু আশা মাখিয়ে, সঙ্গে ওর হাতটা। ও আমার দুর্বল বাধের বাধন ভেঙে আবেগের এমনি বন্যা বইয়ে দিয়েছে যে, সেখান থেকে পিছিয়ে এলে জলে পড়া আর সামনে ঘোরতর অন্ধকার। সেই বান ও অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে আজও নিথর দাড়িয়ে আছি।

কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারবো এমন বিশ্বাস করতে পারিনি কখনো। আজও না! সব সময় ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে নীরস ক্লাস শেষে রিটার্ন টু প্যাভিলিয়ন। এবং খুব বেশি হলে কোথাও দাড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বিড়ি টানা।

ওই আমাকে মাথা তুলে, চোখে চোখ রেখে তাকাতে শিখিয়েছে, আমার মধ্যে পৌরুষত্ব জাগিয়েছে। নারীকে ছুতে শিখিয়েছে।

ওই ছিল আমার জীবনের পাওয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে আমার অস্তিত্বে মিশে গিয়েছিল। আমার চিন্তার এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না যেখানে ও ছিল না। তাই আমার প্রত্যেক কাজেই ওর সুস্পষ্ট উপস্থিতি বিদ্যমান।

ওকে হারানোর চিন্তায় দুর্বল ছিলাম। দুর্বল টানের সবল আশংকাটিই মহাক্ষতের সৃষ্টি করে। আমার দুর্বল মনের এই উক্তিটি ফলেছিল যেদিন সে বললো, আমি তোমার যোগ্য নই।

খুব জোরে হেসেছিলাম। কি জন্যে জানি না। উত্তরে তার ডিসিশনকে অ্যাপৃশিয়েট করেছিলাম।

তবে তারপর একদিন লেকের ধারে যোগ্যজনের হাতে তোমার হাত দেখার পর থেকে পৃথিবীটাকে অনেক সত্য সুন্দর মনে হয়েছে।

এই সত্য দর্শন আমাকে একাকীত্বের নির্মল প্রশান্তি দিয়েছে। শুধু মাঝে মধ্যে তার চলাটা দেখি। খুব দেখতে ইচ্ছে হয় ওই মুখটা। শুধু একবারের জন্য, শুধুই একবারে জন্য। ভয় হয়! দেবীর অসম্মান হবে।

আমি গর্বিত আমার সবটা অর্ঘ মহামায়ার চরণে উৎসর্গ করতে পেরেছি। আমি ধন্য, আমি ধন্য! সত্যিই ঐশ্বর্য রায়, তুমি আমাকে এমন দেবীর চরণে পূজা দিতে শেখালে যেখানে নিজেকে উৎসর্গ করাই সার। পুণ্য মেলে না।

পল্লবী, ঢাকা থেকে
agni_bina@hotmail.com

পাগলি

– পারভেজ লতিফ

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে আমাদের বাড়িতে। তারা ছিল আমার বাবার পরিচিত। তার বাবার চাকরি সূত্রে তারা কিছুদিন ছিল আমাদের এলাকায়। একদিন তারা সবাই এসেছিল আমাদের বাড়িতে। সবার সঙ্গেই পরিচিত হই। তবে দিনটি ঠিক মনে নেই। এখন প্রায়ই মনে হয় ওই দিনটার কথা কেন মনে রাখলাম না। অন্য কিছু না হোক *বন্ধু দিবস* হিসেবে স্মরণে থাকতো।

তখন ইউনিভার্সিটিতে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি। আর সে ছিল খুব সম্ভবত এসএসসি পরীক্ষার্থিনী। প্রথম দিনের পরিচয়েই সম্পর্কের ইতি ঘটতে পারতো। এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেও। কিন্তু কেন জানি তখন ঘটেনি। হয়তো বা মনে একটি ক্ষত সৃষ্টির জন্যই বিধাতা ঘটতে দেয়নি।

পরিচয়ের পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তাকে প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। কিন্তু এটাই বুঝি বিধাতার খেলা।

হঠাৎ একদিন রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা। সে যেন অভিযোগের ডালা সাজিয়ে রেখেছিল যা দেখামাত্রই আমার মাথায় ঢালবে। কেন আমি তাদের বাসায় যাইনি, কেন কোনো যোগাযোগ রাখিনি, আমি এতো অহংকারী কেন ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

কোনো মেয়ের মিষ্টি কথায় তুষ্ট হয়ে একেবারে গলে যাবো এবং সারাক্ষণ তার কথাই ভাববো, ছেলে হিসেবে এমন কখনোই ছিলাম না। আসলে ছোট থেকেই ছিলাম বাস্তববাদী। তাই এমন কোনো কল্পনা কখনোই করি না যা আমাকে বাস্তবতা থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে স্বপ্নের রাজ্যে বসবাস করায়। কিন্তু তার সেদিনের কথাগুলো যেন আমাকে একটু নাড়া দিল। কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে গেলাম অন্য কোনো জগতে। অবশ্য কল্পনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

কবে আসছেন আমাদের বাসায়?

কেন?

কেন মানে? আমাদের বাসায় আসতে আপত্তি আছে?

না, তা নেই। যাবো। এখন কিছুটা ব্যস্ত আছি তো। সামনে পরীক্ষা। পড়াশোনার চাপ। পরীক্ষা শেষ করে অবশ্যই যাবো।

আমার বোকা বোকা ভঙ্গিমার কথা শুনে সে মনে হয় কিছুটা মজা পেল।

পড়াশোনাতে এতোই ব্যস্ত যে, এক ঘণ্টা সময় বের হয় না?

আমি কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলাম। তাই তো, চব্বিশ ঘণ্টায় পড়ি তো মাত্র তিন চার ঘণ্টা। আর পরীক্ষা নিয়ে এমন বক্তব্য দিলাম যেন সারা দিনই পড়ি। রাস্তায় আর কথা না বাড়িয়ে একটা মদন মার্কা হাসি দিয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

শুরু হলো পরীক্ষা। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ব্যস্ততার মাঝে কখন যে ভুলে গেছি তার কথা!

পরীক্ষা শেষ। এরই ভেতর খবর পাই তারা এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তাদের যাবার খবরে মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মনটা কেন খারাপ হলো তা বুঝতে পারলাম না। আসলে মনের ব্যাপারটিই বুঝি এমন।

আচ্ছা, দুনিয়ার সবচেয়ে রহস্যময় বস্তুটির নাম কি মানুষের মন? হবে হয়তো। যাকগে, এসব দার্শনিকের কাজ। এতো কিছু আমার ভেবে কাজ নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের বাসায় যাবো। কিছু না হলেও অন্তত সৌজন্যের খাতিরে।

পরদিন গেলাম তাদের বাসায়। গিয়েই শুনি সে আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপা। আমাকে পেলে নাকি হাড্ডিযুক্ত কাবাব বানাবে। আমি না গেলে নাকি সেই আমাদের বাড়ি যেতো।

মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম। আল্লাহ, কাবাব হওয়ার আগে যেন মা বাবার মুখটা দেখতে পাই।

কিছুক্ষণ পর চোখে-মুখে রাগী ভাব ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে সে এলো আমার সামনে।

আমি ভয় পেলাম। তবে সে ভয় ছিল আনন্দের ভয়। আনন্দের ভয়! না ঠিক ভাষা পাচ্ছি না। তবে সেটি এমনই ভয় যা চোখে-মুখে ফুটে ওঠে না। এ ভয় শুধু মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।

আমাকে কেন পাগলি বলেছেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না। পাগলি আবার কখন বললাম? আর কাকেই বা বললাম? এ নিয়ে ভাবছি।

চুপচাপ দেখে হুংকার ছেড়ে বললো, কেন পাগলি বলেছেন? আমাকে দেখে কি পাগলি মনে হয়? যদি হই তাহলে এখন আপনার সঙ্গে পাগলির মতো আচরণ করবো। আপনাকে মারবো, চুল ছিড়বো, আর, আর...।

এতোক্ষণে বিষয়টি বুঝতে পারলাম। হ্যা, তাকে তো পাগলি বলেছিলাম। তার উল্টা-পাল্টা আচরণ, কথা-বার্তা কারণে অকারণে হেসে লুটিয়ে পড়া দেখে তাদের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠজনকে বলেছিলাম যে, সে একটা পাগলি। বুঝতে বাকি রইলো না এ কথা তার কান পর্যন্ত পৌছেছে। কিন্তু সত্যিকারের পাগলি বলতে যা বোঝায় সে তো তা নয়! আসলে পাগলি যে কেন বলেছিলাম তাতো আমিই জানি না। মুখ দিয়ে কখন কথাটি বের হয়ে গেছে। এ কথা মনে হতেই নিজের গালটা বাড়িয়ে দিলাম।

মারো। ওই কোমল হাতে একটি মার খেলে আমার গালটি ধন্য হবো। আসলে তোমার মতো বুদ্ধিমতিকে যে পাগলি বলে সেই তো মহা পাগল।

থাক। এখন ভালো সাজতে হবে না। ন্যাকামি আমার অসহ্য লাগে।

এ কথা বলেই সে হেসে ফেললো। সত্যি বলতে কি, তার ওই দিনের আচরণ আমাকেই কিছুটা হলেও পাগল বানিয়েছিল এ কথা অস্বীকার করতে পারবো না।

তার নামটি ছিল প্রেমা। প্রেমা আসলে চাদের আলো। তবে পূর্ণিমার রাতের আলো এ কথা বললে ভুল হবে। কারণ পূর্ণিমার আলোর মতো এতো সুন্দর সে নয়। বলা যায়, পূর্ণিমার পরের দিনে চাদের যে আলো থাকে, প্রেমা সেই আলো।

আমরা পূর্ণিমার রাতে চাদ নিয়ে মেতে থাকি। কিন্তু পূর্ণিমার পরদিনও যে চাদে কতো সৌন্দর্য থাকে তা কি কেউ লক্ষ্য করেছে? পূর্ণিমার মতো এতো সৌন্দর্য না থাকলেও একটা মিষ্টি আভা রয়েই যায়। প্রেমা আসলে সেই আভা। খুব সুন্দরী না। তবে তার ভেতরে কি যেন লুকিয়ে আছে যা সহজেই কাছে টানে।

আস্তে আস্তে আমার ভেতর কেমন যেন পরিবর্তন হতে থাকলো। এই আমি কেমন যেন কল্পনা বিলাসী হতে থাকলাম। সারাক্ষণ তার কথাই মনে হতো। দেখতে ইচ্ছা করতো তাকে। ফলে তাদের বাড়িতে কারণে–অকারণে যাতায়াত বেড়ে গেল। গল্পগুজব করতাম।

বন্ধুদের সঙ্গে আডডা মারার নামে বসে থাকতাম কখন সে ক্লাস থেকে ফিরবে। কথা না হলেও দূর থেকে তাকে দেখতাম। এক নজর দেখার জন্য কতোদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে বসে থেকেছি তা ঠিক বলতে পারবো না।

এভাবে দেখতে দেখতে কখন যে বৈশাখ আসার সময় হয়ে গেল! আমার কাছে তার একটা অনুরোধ ছিল, যেভাবে হোক, পহেলা বৈশাখে অবশ্যই যেন দেখা করি। তবে একটি বিশেষ কারণে অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।

গোলাপ ফুল ছিল তার খুব প্রিয়। পহেলা বৈশাখে দেখা করবো বলে তার জন্য একটি লাল গোলাপ কিনেছিলাম। সেটি অবশ্য শুকাতে শুরু করেছিল। তেসরা বৈশাখে তার সঙ্গে দেখা করবো বলে বের হই। রাস্তাতেই তাকে দেখি তার কয়েকটা বান্ধবীর সঙ্গে। তখন বেশি কথা না বলে ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে তাদের বাসায় যাবো এই বলে চলে যাই।

বিকেলে তাদের বাসায় যাই। গিয়ে শুনি সে বাসায় নেই।

ছোট বোনের কাছ থেকে জানতে পারি আমার সঙ্গে দেখা করবে না বলেই যে অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আধামরা গোলাপটা ছোট বোনের হাতে দিয়ে বললাম, প্রেমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিও।

প্রেমার অভ্যাস ছিল ডায়রি লেখার। ছোট বোন আমাকে তথ্যটি দিল।

আপার ডায়রি পড়বেন আপনি? আপার লেখাগুলো অনেকটা সাহিত্যধর্মী।

বিষয়টি অন্যায় হবে জেনেও লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, পেলে পড়া যায়।

তবে শর্ত আছে একটা। আপা যেন এ কথা জানতে না পারে।

শর্তে রাজি হয়ে ডায়রিটা হাতে নিয়ে পরদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ছোট বোনকে যেতে বলি ডায়রিটা ফেরৎ নিতে।

পরদিন অপেক্ষা করছি ছোট বোনের জন্য। কিন্তু একি! দেখি প্রেমা আসছে। আমি হতবাক!

রিকশা থেকে নামে আমারই সামনে।

আমার ডায়রি কোথায়?

ডায়রি তো আছেই। কিন্তু তুমি এতো রেগে আছো কেন? আমি ভয় পেলাম।

রাগবো না! অনুমতি না নিয়ে কেন আপনি আমার ডায়রি পড়েছেন? আপনার ব্যক্তিগত ডায়রি কেউ এভাবে পড়লে আপনার মন খারাপ হতো না? আপনি কি রাগতেন না, আনন্দে লাফাতেন?

তার রাগ ভাঙানোর জন্য তাকে নিয়ে নদীর ধারে যাই।

একটা জায়গায় গিয়ে বসতেই সে আমাকে আমার দেয়া ফুলটি ফিরিয়ে দেয়।

মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।
তাকে বলি, দেখো, দোষ যদি কিছু হয় সেটি আমি করেছি, ফুলটি নয়। তোমার যদি ভালো না লাগে তাহলে ফুলটি ফেলে তার ওপর দিয়ে হেটে চলে যাও। এতে আমি কোনো কষ্ট পাবো না।
সে কিছুটা স্থির হয়।
তাকে বলি, চলো, তোমায় পৌছে দিয়ে আসি। ডায়রিটা তার হাতে দিয়ে রিকশা ডাকি।
আমি হেটে যাবো।
হেটে যাবে? এতো দূরের রাস্তা, একা, একা!
আপনার সঙ্গে আমি হাটতে হাটতে যাবো।
কোনো কথা না বলে পাশাপাশি হাটতে শুরু করলাম।
রাতে ডায়রির বিষয়গুলো আমাকে ভাবাতে লাগলো। প্রেমার ডায়রিতে অজানা কোনো একজনকে উদ্দেশ্য করে লেখা আছে। কেন যেন মন বললো সেই অজানা কেউ অন্তত আমি না। তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি সেই অজানা ব্যক্তিই তার মনে জায়গা জুড়ে আছে।
খুব কষ্ট পেলাম। প্রেমাকে যে কখন ভালোবেসে ফেলেছি তা বুঝতে পারিনি। এ কষ্টই আমাকে বুঝিয়ে দিল ভালোবাসার কথাটি। কিন্তু শত কষ্ট সত্ত্বেও জোর করে কোনো কিছু আদায় করে নেবো এ মানসিকতা কখনই ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম প্রেমার ডায়রির মানুষটা সম্বন্ধে জানবো। নিজের হৃদয় শূন্য করে হলেও প্রেমার হৃদয়টাকে পূর্ণ করবো।
পরদিন তার কলেজে গেলাম।
প্রেমাকে ডাকাতে সে যেন কেমন একটা অচেনা ভাব দেখালো।
বললাম, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
এখানেই বলেন।
এখানে সম্ভব নয়। চলো, নদীর ধারে গিয়ে বসি।
আমি বাইরে কোথাও যেতে পারবো না। বাসায় চলেন।
তোমার কিছু কথা শুনবো যেগুলো বাসায় সম্ভব নয়।
কিন্তু সে কোনোমতেই নদীর ধারে যেতে রাজি হলো না।
এক পর্যায়ে সে আমার সঙ্গে নদীর ধারে যেতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে কেদে ফেললো এবং বাসায় চলে গেল।
কান্নার রহস্য আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেল।
আমি হতবাক। কি করতে কি হয়ে গেল। চাইলাম তার জন্য কিছু করতে আর সে হয়তো আমাকে অন্য কিছু ভেবে চলে গেল। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিলাম। আমি এতো বড় একটা ভুল করে ফেললাম।
আমিও বাড়ি চলে এলাম। নিজের বোকামি এবং প্রেমার ভুল বোঝার কারণে মনটা খুব খারাপ লাগতে লাগলো। প্রেমার আচরণটা যেন ভুলতেই পারছিলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম তার সঙ্গে দেখা করবো না। সে যদি আমাকে বন্ধু, শত্রু বা অন্য কিছু ভেবে থাকে তাহলে সে ভাবনা তার কাছেই থাক। কিন্তু মুখে বললেই মন তো আর তা শোনে না।
কয়েকদিন পর খবর পেলাম তারা এখান থেকে চলে যাচ্ছে নতুন জায়গায়। তাই সবার সঙ্গে শেষ দেখা করার উদ্দেশ্যে তাদের বাসায় গেলাম। সবার সঙ্গে দেখা করে তাকে শুধু বললাম, সেদিনের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। তবে আমার মনে হয়, ওই ঘটনাটাকে তুমি উল্টো চোখে দেখেছো।
প্রেমা কেমন যেন নির্বিকার রয়ে গেল। মনে হলো সে যেন চাইছে আমি চলে যাই। চলে এলাম তৎক্ষণাৎ।

সেদিন প্রেমা আসলে কি ভেবেছিল তা আজও জানি না। কখনো জানতেও চাইনি। তার সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগও রাখি না, রাখা সম্ভব হয়নি।

আসলে প্রেমার কাছ থেকে সেদিন শিখেছিলাম স্বপ্ন সবার দেখা সাজে না। তাই আস্তে আস্তে আগের অবস্থায় ফিরে গেলাম।

এ ঘটনার দুই বছর পরের কথা। আমার ইউনিভার্সিটি জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়। হঠাৎ একটি চিঠি পেলাম। প্রেরকের ঠিকানা না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হলো না চিঠিটা কার।

বুকের ভেতর কাপুনি নিয়ে নিয়ে চিঠিটা খুলছি। কাপুনিটার অবশ্য একটা কারণ আছে। আমাকে একবার *ছয় টাকা (৩×২) দামের অপমান* খামে করে পাঠিয়েছিল যার স্মৃতি চিহ্ন এখনো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

ভয়ে ভয়ে চিঠিটা খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। চিঠির ভাষায় বুঝতে পারলাম সে কিছুটা অসহায় অবস্থায় রয়েছে। স্বভাব সুলভ পাগলামি কথাবার্তা তার চিঠিতেও। তার চিঠির ভাষা আমাকে ভাবিত করলো। সে সবাইকে বাদ দিয়ে এতোদিন পর কেন আমাকে চিঠিতে তার কিছু কষ্টের কথা লিখে জানালো? সে কি তবে আমাকে তার ভালো বন্ধু ভাবে? ভাবতেও পারে। হয়তো আমি যেভাবে ভেবেছি প্রেমা সেভাবে ভাবেনি। অথবা আমার দুজনের ভাবনাতেই গরমিল ছিল। হয়তো ছিল, হয়তো না।

সে যেভাবে ইচ্ছা ভাবুক না। সে যদি আমাকে তার বন্ধু ভেবেই থাকে তাহলে আমি কেন একতরফা তার ওপর বন্ধুত্বের বদলে ভালোবাসা চাপিয়ে দেবো? কারো ভালোবাসা না পেলে তো বন্ধু হওয়া যায় না? সে অন্য কিছু না হয়ে বন্ধু হয়েই নাহয় আমার হৃদয়ে থেকে যাক। আমার মনে জায়গা করে রাখুক পাগল বন্ধু হিসেবে।

রাজশাহী থেকে

অশ্রু শূন্য কান্না

– হাসান মাহমুদ

ভালো করে ভাবতে গেলে প্রতিটি মানুষের জীবনে একটা লোমহর্ষক গল্প আছে। যে উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা প্রতিটি জীবনকে ঘিরে তার সঙ্গে তুলনা চলে।

আমার বাবা তখন একটা উপজেলা শহরের সরকারি কর্মকর্তা। সেখানকার স্কুলে ক্লাস এইটে পড়তাম। আমরা যে কয়েকজন বৃত্তি নিয়েছিলাম তাদের আলাদা ক্লাসরুমে কোচিং হতো। ক্লাসের ফাকে, এমনকি ছুটির পরেও আমরা ছেলেমেয়েরা মিলে আড্ডা মারতাম। খুব মজাতেই আমাদের দিন কাটছিল।

কিছুদিন পরে আমাদের ক্লাসে একটা নতুন মেয়ে ভর্তি হলো। কারণ, তার বাবা বদলি হয়ে এসেছেন। মেয়েটি দেখতে চমৎকার। চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হলাম। তার চোখে চোখ রেখে মনে মনে বললাম, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দর কেউ নেই। আমি অন্তত দেখিনি। মেয়েটি খুব লাজুক ছিল।

তার সঙ্গে কথা বলতাম না। কিন্তু সারাক্ষণ তার উদ্দেশ্যে টিটকারি ছুড়তাম। ননস্টপ।

সকলে মিলে খেপানোর ফলে মেয়েটি লজ্জায় লাল, নীল, বেগুনি হয়ে যেতো।

মেয়েটির বাবা চাকরিজীবী বলে তারাও আমাদের মতো সরকারি বাড়িতে থাকতো। পাশাপাশি থাকার কারণে স্কুলে আসা–যাওয়ার পথে প্রায়ই আমাদের দেখা হতো। তখনো তাকে খেপানো ছাড়তাম না। আর বিকেলে খেলতে বের হলে তো কথাই নেই।

একদিন বিকেলে বাসার সামনে কৃকেট খেলছি। এমন সময় সে আমায় ডাকলো।

তোমরা আমার সঙ্গে অমন করো কেন? আমি কি তোমাদের বন্ধু হতে পারি না?

সেই থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের শুরু। আমরা একত্রে স্কুলে যেতাম–আসতাম আর বেঞ্চেও পাশাপাশি বসতাম। আমি ক্লাস ক্যাপটেন থাকার কারণে আমার আসন নির্দিষ্ট ছিল এবং মেয়েটিও আমার পাশে বসতো। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, অন্য সকলে আমার পাশে তার জায়গা ছেড়ে দিয়েই বসতো।

ক্লাসে স্যার কিছু লিখতে দিলে তা মেয়েটি আমার খাতা দেখে লিখতো। এ জন্য আমিও ভালোভাবে পড়া তৈরি করে নিতাম। স্যারদের বকুনির ভয়ের চেয়ে তার কাছে লজ্জাই ছিল আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বলতে দ্বিধা নেই, আমার ট্যালেন্টপুলে বৃত্তির পেছনে তার অবদানটা ছিল সবচেয়ে বেশি।

তখন থেকে আমার বিকেলে কৃকেট খেলা ভেস্তে গেল। প্রায় বিকেলে আমরা বাসার ছাদে, পুকুর ঘাটে কিংবা নদীর ধারে বসে গল্প করতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেতো। তবু আমাদের গল্প শেষ হতো না। আবার মাঝে মধ্যে অনেকক্ষণ, বহুক্ষণ দুজনের কেউ–ই কোনো কথা বলতাম না। একেবারে চুপ করে চোখে চোখ রেখে বসে থাকতাম ক্লান্তিতে নয়, বিরক্তিতে নয় – বিকেলের সোনা রোদে নিছক ভালোলাগায় দুজনে নিঃশব্দে বুদ হয়ে থাকতাম। মনে মনে ভাবতাম এতো সৌভাগ্যও কি আমার জীবনে ছিল! যাকে জীবনে চোখে দেখিনি, অথচ আকৈশোর স্বপ্নে দেখেছিলাম। যার সঙ্গে আলাপ হয়নি। কিন্তু মনে মনে ভীষণ আলাপ ছিল, যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের সঙ্গী, যে সুরুচির শান্ত, স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি, যে কি–না এমন ঝড়ের ফুলের মতো উড়ে এলো? উড়ে এলো আমার হৃদয় মন্দিরে!

এভাবেই আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেলি। আমাদের ভালোবাসার তীব্রতা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু আমরা দুজনের কেউই মুখে বলিনি আমাদের ভালো লাগার কথা।

এমনি অনাবিল আনন্দে দিন যায়, বসন্ত আসে, নক্ষত্রেরা ঝরে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এতো আনন্দ সইলো না। আমি ঈশ্বরকে মানি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে কোনো মহৎ অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা মানি। যে শক্তি পাখির গলায় সুর দিয়েছে, প্রজাপতির ডানায় রং, ফুলের মাঝে কোমলতা, নারীর হৃদয়ে প্রেম, তাকে মানি। কিন্তু সে যে তার সৃষ্টিকে দুঃখের সাগরে ভাসাতে পারে তা মানতে চায় না মন। তাই–ই ঘটেছিল আমার জীবনে।

ওখানকার এক স্থানীয় প্রভাবশালী সিনিয়র ভাই তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিল। প্রত্যাখ্যাত হয়েও প্রচণ্ড জ্বালাতন করতো এবং আমি সব সময় তার সঙ্গে থাকতাম বলে আমার মারফত তার কাছে চিঠি পাঠাতেন।

আমিও ভয়ে ভয়ে তার কথা শুনতাম। হায়! আমি তখন নায়ক থেকে ঘটক হয়ে গেলাম।

একদিন স্কুলে যাবার পথে সিনিয়র ভাই তাকে আটকালেন। থ্রেট দিলেন। অপহরণের হুমকি দিলেন।

ক্লাসে মেয়েটির কাছে সব কথা জানতে চাইলে সে আমাকে পাশের রুমে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ কেদে কেদে সব কথা বললো।

গল্প করতে করতে কখন যে ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। স্যার ক্লাসে আমাদের দুজনার ব্যাগ পেয়ে ও আমাদের না পেয়ে ব্যাগ জব্দ করে টিচার্সরুমে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের পাশের রুমে দেখতে পেলেন। এবং আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উপর্যুপরি বেতের বাড়ি আরম্ভ করলেন।

আমাকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা পিটুনি দেয়ার পরে তাকে যখন মারতে গেলেন তখন স্যারের পা ধরে বললাম, স্যার, ওকে মারবেন না। আমি ওকে ডেকে এনেছি, সব দোষ আমার।

স্যার একথা শুনে একটা অশ্লীল গালি দিয়ে দুজনকেই মারতে লাগলেন। কতোক্ষণ যে মারলেন হিসাব নেই।

স্যার চলে যাবার পর এই জীবনে প্রথমবারের মতো তাকে জড়িয়ে ধরলাম। মেয়েটিও আমাকে আকড়ে ধরে কাদলো বহুক্ষণ। তখন ক্লাস রুমের জানালায় ভিড় জমে গেছে।

এ কথা আমাদের বাবা মায়ের কানে গেল। দুই পরিবারের কথা বলা বন্ধ হলো। তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলো এবং সেই সিনিয়র ভাইটি খেপে গেলেন।

তাকে ছাড়া একাকী প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে কেটে গেল পনেরো বিশ দিন। পাশাপাশি না থাকলেও সব সময় তার পাশাপাশি ছিলাম। তাকে দেখতে পেতাম, তাকে কাছে পেতাম সব সময়। যদি জানতে চাওয়া হয় কিভাবে? বলতে পারবো না, একাকী থেকেও মনে হতো কোনো এক জায়গায় সে একান্তই আমার। আমার মতো করে তাকে আর কেউ জানে না। এমন ভাবনা আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে, একাকী থাকতে সাহায্য করেছে।

তারপর এক বান্ধবীর মারফত তাকে একটা চিঠি পাঠালাম।

চিঠি পেয়ে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো স্কুলের পেছনে।

তাকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরে হাজারটা চুমু খেলাম।

সেও আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো। চুমুতে চুমুতে আমার সমস্ত মুখ ভরিয়ে দিল। বুভুক্ষের মতো আমার ঠোটের সমস্ত রস শুষে নিল।

এরপরের ঘটনাগুলো এতো দ্রুত ঘটে যেতে লাগলো যে, আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

সিনিয়র ভাইয়ের এক চ্যালা আমাদের দেখতে পেয়ে সিনিয়র ভাইকে নিয়ে এলো। আমাকে ইচ্ছা মতো পেটালেন।

তখন আমার মনে হচ্ছিল আকাশটা নোংরা কাদায় ভরা, বাতাসে বিষ।

হসপিটালে সকলের সামনে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, আমি তোমাকে বিয়ে করবো, কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবো না।

কিন্তু সে হয়তো মনে মনে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল।

শুরু হলো আমার বন্দী জীবন। বাবা মায়ের কাছে সান্ত্বনার বদলে মার খেলাম প্রচণ্ড। আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখা হলো, কথা বলা বন্ধ করে দিল সকলে। তার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করতে দিলেন না বাবা–মা।

না পাওয়ার এক যন্ত্রণা নিয়ে দগ্ধ সময় কাটতো আমার। তবুও আমি আশা ছাড়িনি। নতুন স্বপ্নে ঘুম ভাংতো আমার। কিন্তু যার জন্য এতো কষ্ট সে তার কথা রাখলো না। আমাকে ছেড়ে, এই নোংরা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরতরে চলে গেল অন্যলোকে।

তারপর?... তারপর সিনিয়র ভাইটি তার বাবাকে বদলি করালেন এবং অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

আমার বাবা আমাকে ঢাকায় পাঠালেন মামার কাছে। এবং তিনিও অনেক টাকা খরচ করে ওখান থেকে বদলি হয়ে চলে এলেন।

কিন্তু ওখানকার গাছপালা পোকা, মাকড়, বাতাসটা পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এসব কথা কাকে বোঝাবো? ওখানকার আকাশে মেঘ ও রোদের খেলা, জলের লহরী, পাতার কাপন, উড়ন্ত পোকার পাখনায় আলোর বর্ণালী আমি ছাড়া আর কে দেখবে?

ওখানে বসে মেয়েটির থেকে কতো শিখেছি! কতো কি বুঝতে পেরেছি। অনুভূতি হয়েছে কতো সূক্ষ্ম। আমাকে কেন পাগল ভাবে লোকে?

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা থেকে

অপ্রকাশিত

– ইমন

যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন নিজের সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রেমে পড়ি। বড় সাধ ছিল আমার প্রেমকে একটু ছুয়ে দেখার, পারিনি। তাকে নিয়ে কতো স্বপ্ন দেখেছি, কতো পাগলামি করেছি। কিন্তু

সে যেমন এসেছিল হঠাৎ করে তেমনি হঠাৎ করেই আমার স্বপ্নগুলোকে ভেঙে দিয়ে চলেও গিয়েছিল। যা হোক। আমি এ দুর্ঘটনার কথা বলছি না।

রীপুকে যখন প্রথম দেখি আমি তখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। তাকে দেখে আমার ভাঙা স্বপ্নগুলোকে সাজাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয় না। কারণ, তার কথাবার্তায় ছেলেদের প্রতি তিক্ততা স্পষ্ট। কেন এই তিক্ততা তা জানি না।

তাকে বিভিন্নভাবে দেখতে শুরু করি আর অবাক হই। তার কথা বলা, চলাফেরা সব কিছু আকৃষ্ট করে আমাকে।

আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে তখন আমার নাম গোপন রেখে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে কেউ একজন তার প্রেমে পড়েছে।

সে বুঝতে পারে এ কেউ একজনটা কে? সে যেমন বোঝে তেমনি বুঝিয়েও দেয় যে, আমাকে তার খারাপ লাগে না।

আমার স্বপ্নগুলোকে যেমন সাজাতে শুরু করি তেমনি মনের মধ্যে ভয়ও দানা বাধতে শুরু করে, রীপুকে কি করে আমার জীবনের ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা জানাবো! এমনিতেই মুখস্থ করে যাওয়া কথাও ওর সামনে ভুলে যাই। তার উপর ছেলেদের সম্পর্কে তার মন্তব্য হলো *ছেলেরা প্রেম করা ছাড়া আর কিছু বোঝে না।*

প্রায় দিনই ভাবি যে, আর দেরি করা যায় না। কিন্তু প্রসঙ্গটা শুরুই করতে পারি না।

রীপু নানান রকম কথা বলে, হাসে।

আমি অবাক হয়ে দেখি।

থার্ড ইয়ারে থাকা অবস্থায় এক শীতের সকালে আমি সব জড়তা ঝেড়ে রীপুর কাছে যাই। উদ্দেশ্য ছিল, রীপুকে যেমন আমার ভালোবাসার কথা বলবো তেমনি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথাও জানাবো। এতে যদি আমার তিল তিল করে সাজানো স্বপ্ন ভেঙে যায় তো যাবে!

সেদিন আমার এক বন্ধুর সহযোগিতায় প্রথমবারের মতো রীপুর সাথে একা কথা বলার সুযোগ পাই।

রীপু অবলীলায় অনেক কথা বলে যায়।

আমি অবাক হয়ে শুনি কি সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলে রীপু!

সে তার পরিবারের সবার কথা বলে যায়, মাঝে মধ্যে আমার সম্পর্কে জানতে চায়।

আমি উত্তর দেই। কিন্তু আসল কথায় যেতে সাহস হয় না আমার।

সকাল গড়িয়ে কখন দুপুর হয়ে গিয়েছিল তা বুঝে উঠতে পারিনি।

সে তাগাদা দেয় রুমে ফেরার।

কিন্তু আমি রুমে ফেরার কোনো তাগাদা অনুভব করি না। কেবল তার সঙ্গটাকেই মুখ্য মনে হয়।

রীপু রুমে ফিরে যায়।

তাকে কিছুই বলা হয় না। আমি আরেক দিনের অপেক্ষায় থাকি।

রাজনীতিতে যেমন এক তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হতে চলেছে তেমনি আমার অপ্রকাশিত ভালোবাসাতেও এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটে, রীপু এই তৃতীয় পক্ষের কাছেই জানতে পারে আমার কলেজ জীবনের ঘটনা। ছেলেদের প্রতি তার তিক্ততা যেন বহুগুণ বেড়ে যায়।

দিশেহারা হয়ে পড়ি। নিজেকে ধিক্কার দিই কেন নতুন করে স্বপ্ন দেখতে গেলাম! কেন রীপুকে সব খোলাখুলি বললাম না? নিজেকে নিজের কাছেই খুব ছোট মনে হচ্ছিল। রীপু আমায় ভালো না বাসুক, তাকে সব ঘটনা খোলাখুলি বললে তার কাছে এতো ছোট হতাম না।

এরপর রীপুর সঙ্গে আর আমার কথা হয়নি। দেখা হলেও এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায় যেন দেখতেই পায়নি আমাকে। খুবই অস্বস্তি বোধ করি।

রীপুকে আমার কলেজ জীবনের কথা জানাইনি। কিন্তু সে জেনেছে। তাকে ভালোবাসার কথা বলিনি তবে সে বুঝেছে। কিন্তু সে কোনোদিনও জানবে না যে, প্রতিটি উৎসবে আলাদাভাবে তার জন্য চুড়ি কিনে রেখেছি নিজ হাতে পরাবো বলে। সে জানবে না যে, তার প্রতি জন্ম তারিখে ক্যাম্পাসের তাল পুকুরে গভীর রাতে মোম জ্বালিয়েছি, কেক কেটেছি।

রীপুর প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো রাগ নেই। সে যেখানেই থাক সুখে থাক, ভালো থাক।

রাজশাহী থেকে

ভয়ঙ্কর খেলা

– সাজেদা হোসেন

আজ হঠাৎ করেই পুতুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইশ! কতোকাল পর ওকে দেখলাম। তা প্রায় তিন যুগ তো হবেই। চেহারা আর স্বাস্থ্যে আমূল পরিবর্তন হলেও ঠিকই চিনেছি।

আর চিনবোই না কেন? একদিন কতো গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। সামান্য অদর্শনেই মনটা খা খা করতো সাহারা মরুভূমির মতো। অথচ সেই পুতুল আজ কেমন না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল। কতো সহজে আমার হাতটা ছাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আমরা ছিলাম ছয় বান্ধবী। ক্লাস ফোর থেকে পুতুল, বর্ণা, নীরা, রুমি, ঝুমা আর আমি একই স্কুলে পড়ে আসছিলাম।

এক্কা, দোক্কা আর পুতুল খেলার সেসব দিনগুলো কতো সুন্দর ছিল! পঙ্খিরাজের পাখায় চেপে ভেসে যেন কেটে যাচ্ছিল একেকটা দিন।

কিন্তু আমরা বড় হয়ে গেলাম। চারপাশের আটপৌরে পৃথিবীটা যেন অন্য রকম হয়ে গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমের উপন্যাস পড়া শুরু করলাম। এবং রোমান্টিক কবিতা দেখলেই তা খাতায় টুকে রাখি। স্কুল বাসের আশপাশে রোমিওদের ঘোরাঘুরি মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারি আমরা আর আগের মতটি নেই।

তখন সদ্য ক্লাস টেন–এ উঠেছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই *ভুলনা আমায়* টাইপের বেশ কিছু চিঠিপত্রও পেয়ে গেছি। ভুল বানান সর্বস্ব, রুল টানা খাতার পাতায় লেখা সেসব চিঠি লুকিয়ে বান্ধবীরা মিলে পড়ি আর হেসে লুটিয়ে পড়ি। আহা বেচারারা!

আমাদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো সুন্দরী ছিল রুবি। দুধে–আলতা গায়ের রঙ, এক মাথা মন কুঞ্চিত কেশদাম কোমর ছাপিয়ে গেছে এবং ধনুকের মতো বাকানো ভ্রূ নিচে কাজলকালো টানা চোখ। তবে সৌন্দর্যের অনেকখানিই খাটো হয়ে গিয়েছিল ওর উগ্র মেজাজের জন্য।

এমন রূপবতী রুবির বাসায় ছিল বাড়াবাড়ি রকমের কড়াকড়ি। রুবিকে রাত–দিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিতেন ওর মা। তার নজরদারিতে কোনো পুরুষ মশা–মাছিরও ঢোকার সাহস ছিল না ওদের বাড়িতে। প্রতিদিন রুবিকে স্কুল বাসে তিনি তুলে দিতেন পরিদা–র জিম্মায়।

পরিদা–র মুখ আর জাগ্রত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দুটোই এক। তাই আশপাশের উৎসাহী রোমিওদের নিরাপদ দূরত্বে দাড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা ছাড়া অন্য কিছুই করার ছিল না।

কিন্তু বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসর ঘরেও সাপ ঢুকেছিল।

একদিন দেখি রুবির হাবভাব যেন অন্য রকম। ক্লাসে ঢুকেই ফিশফিশ করে আমাদের বললো, তোদের একটা জিনিস দেখাবো।

আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠতেই বললো, এখন না, টিফিনের সময়।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পার করলাম চার চারটা ক্লাস। টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই কোনোমতে টিফিন গিলে ছুটলাম রুবির পিছু পিছু। দেখলাম ওর হাতে সমাজ বিজ্ঞানের মোটা বইটা। আমাদের আর তর সইছে না।

কিন্তু রুবি হাটছে তো হাটছেই।

বুঝলাম ওর গন্তব্য স্কুল দালানের পেছন দিকটায়। ওখানে একটা তুত ফলের গাছ আছে। ওটার খসখসে পাতাগুলোতে হাজার হাজার শুয়োপোকার আস্তানা। ওদের ভয়েই বোধহয় এদিকটায় পারতপক্ষে কেউ আসতে চায় না। আমারও শুয়োপোকাকে প্রচণ্ড ভয়। কৌতূহলের কাছে ভয়ের পরাজয় হলো।

আমরা গাছতলায় রুবিকে ঘিরে দাড়াতেই ও বইয়ের মলাট খুলে একটা নীল রঙের খাম বের করে আনলো। খামের ভেতর থেকে একটা ফিনফিনে নীল কাগজ বের করতেই কিছু শুকনো গোলাপের পাপড়ি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়লো। এবং মিষ্টি একটা সুবাসে ভরে গেল চারপাশ।

বিস্ফারিতে চোখে তাকিয়ে আছি আমরা। অমন সুবাসিত সুদৃশ্য চিঠি আগে কখনো দেখিনি। সঙ্গে একটা ছবিও আছে। ছবির যুবকটি দেখতে তখনকার দিনের উর্দু ছবির জনপ্রিয় নায়ক ওয়াহিদ মুরাদ–এর মতো। অবিকল ওই রকম চুলের স্টাইল। দেখা আর শেষ হয় না আমাদের!

নীরা ভালো আবৃত্তি করতে পারে। তাই চিঠিটা ও আমাদের পড়ে শোনালো।

চিঠি তো পড়া শেষ হলো। কিন্তু আমরা বাকহারা। কি চমৎকার চিঠি!

ঈর্ষার একটা সূক্ষ্ম খোচাও অনুভব করলাম যেন।

ধীরে ধীরে রুবি সব বললো।

পত্র লেখক সেলিম। ওদের পাশের মহল্লারই বাসিন্দা। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র আর ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। এমন সুপাত্রের একটু কৃপা দৃষ্টির আশায় মুখিয়ে আছে অনেক মেয়েরাই। কিন্তু সেলিমভাই ধরা পড়েছেন রুবির রূপের জালে।

এর মাঝেই বেরসিক ঘণ্টাটা বেজে উঠলো টুনটুন করে, সময় শেষ। সেদিনের মতো ক্লাসে চলে এলাম সবাই। কথা রইলো আগামীকাল আলাপ হবে এ ব্যাপারে।

এখনকার মতো ফোনের সুবিধা ছিল না সে আমলে। তাই যা কিছু গল্প আলাপ হতো সব স্কুলেই।

পরদিন আমরা সবাই জড়ো হলাম পুকুরঘাটে। ওখানে একটা চমৎকার ঘাট ছিল সিমেন্টে বাধানো।

নীরা ক্লাসের জানালা টপকে আগেই গিয়ে এক ঠোঙা বুট ভাজা নিয়ে এলো। ওর মতে, শক্ত বুটভাজা চিবোলে নাকি মগজ নড়ে গিয়ে বুদ্ধি খোলে।

দেখলাম এ একদিনেই রুবির অমন সুন্দর মুখটা শুকিয়ে আমসি। টিফিনও খায়নি ও। বুঝলাম অবস্থা কেরোসিন। প্রথমে নীরাই মুখ খুললো, ও আবার আমাদের অঘোষিত লিডার!

রুবির প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেলিমভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। ওদের বাসা থেকে সেটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না যদি না আমরা সাহায্য করি। আর যোগাযোগ না করলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে!

নীরা সবাইকে বুদ্ধি বের করতে বললো।

হাতে হাতে বুট ভাজার ঠোঙা ঘুরছে, প্রাণপণে বুট চিবোচ্ছি। কিন্তু কোনো বুদ্ধি বের হচ্ছে না।

আবার মুখ খুললো নীরাই। ওর মাথা আবার ফন্দি–ফিকিরে ঠাসা। বললো, রুবি, চিঠি লিখতে পারবে না। কারণ, ওর বাসার যা অবস্থা তাতে ধরা পড়বেই। আর ধরা পড়লে খালাম্মা আস্ত রাখবেন না।

রুবির মায়ের প্রসঙ্গে নড়েচড়ে বসলাম। দুই একবার তার সামনে পড়তে হয়েছিল। জেরার চোটে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আমার।

নীরা আবার বলা শুরু করলো। রুবিদের বাসায় ফোন আছে। কিন্তু খালাম্মার অগোচরে সেটার তালা খোলা আর ব্যাংকের লকার ভাঙা একই কথা। আমাদের অন্য কারো বাসায় ফোন নেই। তবে পুতুলের কথা আলাদা। পুতুল ওর খালার বাসায় থেকে পড়াশোনা করে, ওখানে ফোন আছে। এবং নিষেধাজ্ঞারও বালাই নেই। এখন কথা হলো, ওখানে গিয়ে তো রুবির কথা বলা সম্ভব নয়। খালাম্মা কিছুতেই ওকে একা ছাড়বেন না।

তাহলে উপায়?

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর নীরাই বললো, শোন, একটা বুদ্ধি বের করেছি।

উৎসুক দৃষ্টিতে সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

ও বললো, পুতুল যদি রুবি সেজে সেলিমভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে তবেই সব দিক রক্ষা হয়।

চমকে উঠলাম! বলে কি নীরা? এও কি সম্ভব?

পুতুল হাউমাউ করে উঠলো, না না এসবের মধ্যে আমি নেই, আমার পড়ার ডিসটার্ব হবে।

সত্যিই পুতুল আমাদের মধ্যে ভালো ছাত্রী। গরিব ঘরের অনেকগুলো ভাইবোনের মধ্যে ওই বড়। ওর মা–বাবার আশা, পড়াশোনা করে ও একদিন সংসারের হাল ধরবে। তাই তো ধনী বোনের কাছে সপে দিয়েছেন পুতুলকে লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য। কিন্তু কে শোনে পুতুলের কথা।

নীরা, বর্ণা আর ঝুমা ওকে প্রাণপণে বোঝাচ্ছে। আমি চুপ করে আছি! ব্যবস্থাটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। ভেবেছিলাম রুবিও রাজি হবে না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম মোটাবুদ্ধির রুবি সহজেই রাজি হয়ে গেল।

ঠিক হলো পুতুল আজ রাতেই রুবি সেজে সেলিমভাইকে ফোন করবে।

পরদিন স্কুল ছুটি। তাই কিছুই জানতে পারলাম না।

সোমবার স্কুলে পৌছে দেখি পুতুল আগেভাগেই এসে গেছে। আমাদের দেখে সলজ্জ হাসি হাসলো। কেমন যেন অন্য রকম লাগলো ওকে। যথাসময়ে আসর বসলো আমাদের। শুনলাম পুতুলকে রুবি ভেবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ চালিয়েছেন সেলিমভাই। বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেননি।

আর সন্দেহ করবেনই বা কেন, আগে তো কখনো রুবির গলার স্বর শোনেননি। তাছাড়া প্রেমে পড়লে ছেলেরা এমনিতেই হাবা হয়ে যায়।

দেখলাম পুতুল ওদের আলাপচারিতা একটা খাতায় টুকে এনেছে যাতে রুবির বুঝতে সুবিধা হয়। কি রোমান্টিক সব কথাবার্তা! পড়ে শোনাতে শোনাতে পুতুলের শ্যামলা গাল বেগুনি হলো আর গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো আমাদের।

শুনলাম এই আলাপচারিতার মধ্যে পুতুল দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছে আর চারটে স্বরচিত কবিতাও পাঠ করেছে।

আতকে উঠলাম, এইরে, রুবি তো গানের *গ*–ও জানে না, সেলিমভাই যদি বাসর ঘরে গাইতে বলে ওকে!

রুবি চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইলো। সবাই হি হি করে নিলাম বেশ খানিকক্ষণ।

বর্ণা বললো, অসুবিধা কি, তুইও গান শিখে ফেল না।

রুবির সুন্দর মুখটা ঝুলে পড়লো।

আমরা তো জানি আয়নার সামনে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজই ভালোলাগে না ওর। কোনোমতে পাস করে যায় বছর বছর এই আর কি!

এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছু দিন। রুবির বাহ্যিক আর পুতুলের অন্তরের সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে রইলেন সেলিমভাই।

তবে চোখের সামনে বদলে যেতে দেখলাম পুতুলকে। লেখাপড়ায় আর ওর উৎসাহ নেই, ক্লাস টেস্টের মার্কসগুলো প্রচণ্ড খারাপ আসতে শুরু করলো। তার বদলে ওর খাতার পাতা ভরে উঠলো চমৎকার সব রোমান্টিক কবিতায়। অবশ্যই সেগুলো সেলিমভাইয়ের উদ্দেশে।

একটা বছর খুব দ্রুত ফুরিয়ে গেল। সামনেই এসএসসি পরীক্ষা। আমাদের ফেয়ারওয়েলের দিনটিও এসে গেল ঠিক করলাম। ওই দিনটিতে আমরা সবাই শাড়ি পরে আসবো।

রুবি ওর গত জন্মদিনে সেলিমভাইয়ের পাঠানো শাড়িটাও পরতে পারবে এই উপলক্ষে।

নির্দিষ্ট দিনে স্কুলে এসে রুবিকে দেখে চোখে আর পলক পড়ে না আমাদের। ওর পরনে আকাশি রঙের জরিপাড় একটা চমৎকার সিল্ক শাড়ি।

আরে, এই রঙটাতো পুতুলের প্রিয়। নিশ্চয়ই সেলিমভাই ফোনে ওর পছন্দের রঙ জেনে নিয়েছিলেন। প্রিয়ার ভালোবাসা মাখানো শাড়িতে সুন্দরী রুবি সেদিন আরো অপরূপা হয়ে উঠেছিল।

পুতুল কালোপাড়ের শাদা শাড়িতে আরো শাদামাটা হয়ে ম্লানমুখে দাড়িয়েছিল। ওর চোখে যেন ঈর্ষার হাল্কা ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম। চোখের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে আমাদের স্কুল জীবনের শেষ দিনটি ফুরিয়ে গেল।

মাস তিনেক পরেই পরীক্ষা। এর মধ্যে পুতুলের খালা তার প্রবাসী ছেলের কাছে চলে গেলেন। অগত্যা পুতুলও ফিরে গেল ওদের নিজেদের বাসায়। ফলে সেলিমভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল ওর।

পরীক্ষার পড়া নিয়ে আমরাও এতো ব্যস্ত হয়ে গেলাম যে, অন্য কোনোদিকেই আর খেয়াল ছিল না। সবার সঙ্গে দেখা হলো একেবারে পরীক্ষার হলে। পুতুলকে দেখে চমকে উঠলাম, এ কি চেহারা হয়েছে ওর! কি সাংঘাতিক শুকিয়েছে আর কেমন যেন কুজো হয়ে হাটছে। ভাবলাম ভালো ছাত্রী তো। তাই পড়তে পড়তে এই অবস্থা।

রুবি বললো, ফোনে যোগাযোগ বন্ধ হওয়ায় সেলিমভাই নাকি খেপে উঠেছেন। যে কোনো সময় কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। তাই রুবি ভয়ে সিটিয়ে আছে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, সামনে অখণ্ড অবসর। এর মধ্যে হঠাৎ শুনলাম সেলিম ভাইয়ের হাত ধরে বাড়ি থেকে রুবি পালিয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

কয়েকদিন পর নীরা আর বর্ণা এলো হন্তদন্ত হয়ে। শুনেছিস, পুতুল নাকি খুব অসুস্থ চল ওকে দেখতে যাই।

অনেক খুজে পেতে পুরনো ঢাকার গলি তস্য গলি পেরিয়ে ওদের বাসায় পৌছে দেখলাম মলিন বিছানার ওপর ততোধিক মলিন চেহারার পুতুল শুয়ে আছে বিছানার সঙ্গে প্রায় লেপটে।

ওর মা আমাদের দেখে যেনো হালে পানি পেলেন।

কথাবার্তা বলে বুঝলাম অসুখ ওর শরীরে নয়, অসুখ ওর মনে। তবে পুতুলের মলিন মুখে হাসি ফুটলো আমাদের পেয়ে।

বিদায় নেয়ার সময় ওর মা আমাদের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমরা মাঝে মধ্যে এসো। জানি না, আমার মেয়েটা কেন এমন হয়ে গেল!

আবার যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসি। পথে নীরাকে বললাম, ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়েছে। আমাদের উচিত হয়নি এ রকম করা। এখন কি হয় কে জানে!

নীরা এক ফুৎকারে আমার কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

মাস খানেক পর শুনলাম সেলিমভাইকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তাদের বাড়িতে রুবিসহ।

কিন্তু খালাম্মার রাগ পড়েনি। তিনি মেয়ের মুখদর্শন করবেন না বলে দিয়েছেন।

সেলিমভাইয়ের বাবা–মা ঘটা করে বৌভাত করছেন। আমরাও নিমন্ত্রণ পেলাম।

নির্দিষ্ট দিনে বর্ণাদের বাসায় সবাই একত্র হলাম অনুষ্ঠানে যাবো বলে। কিন্তু পুতুলকে দেখছি না। ওর খোজ করতে শুনলাম ওকে খবরই দেয়া হয়নি।

নীরা ফিশফিশিয়ে বললো, ওর যা মনের অবস্থা, ওর ওখানে না যাওয়াই ভালো। বোকাটা এমন ফেসে যাবে কে জানতো।

মনটা ভার হয়ে রইলো আমার।

সেলিমভাইদের ওখানে গিয়ে দেখলাম প্রচুর আয়োজন, অনেক মানুষের ভিড়। কিন্তু অতো আলো অতো হাসি–আনন্দের মধ্যেও রুবিকে কেমন যেন নিষ্প্রভ লাগছিল। সোনালি কারুকাজ করা রানী রঙ বেনারসি আর জড়োয়া গহনাও ওর মুখ–চোখের বিষণ্নতা ঢাকতে পারেনি।

আমাদের দেখে জোর করে হাসি টানলো মুখে।

ভাবলাম হয়তো বাবা–মায়ের জন্য মন খারাপ। সেলিমভাইকেও দেখলাম কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব।

নীরাকে দেখলাম রুবির সঙ্গে গুজ গুজ করতে সারাক্ষণ।

ফেরার পথে নীরার কাছেই শুনলাম সেলিমভাই নাকি এখনকার রুবিকে মেলাতে পারছেন না ফোনের রুবির সঙ্গে। বার বার তাল কেটে যাচ্ছে। তিনি নাকি জানতে চেয়েছেন সত্যিই ওটা রুবি ছিল কি না। দুজনের মধ্যে নাকি প্রায়ই খিটিমিটি লেগে যাচ্ছে।

বললাম, লাগবেই তো, রুবি কি আর পুতুলের মতো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারে? তাছাড়া ওর যা মেজাজ।

নীরা অবশ্য সত্যি কথাটি স্বীকার করতে নিষেধ করে এসেছে রুবিকে। আমাদেরও সাবধান করে দিল।

এরপর বোর্ডের পরীক্ষার ফল বের হয়ে গেল।

আমি, নীরা, বর্ণা আর ঝুমা পাস করে গেছি ভালোভাবেই, রুবি কোনোমতে। আর পুতুল! সেটাই হলো বড় ট্র্যাজেডি। ও ডাহা ফেল করে বসেছে। অতো ভালো ছাত্রী যে এমনটা করতে পারে সেটা কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফলে যা হবার তাই হলো। পুতুলকে পড়াতে রাজি হলো না ওর খালা। শুনলাম ওর বিয়ের জন্য পাত্র খোজা হচ্ছে।

ইশ, কি হয়ে গেল। কতো আশা–ভরসা ছিল বাবা–মায়ের।

কলেজে ভর্তি হলাম আমরা চারজন। রুবির পড়ার ওখানেই ইতি। কলেজে যাই। কিন্তু নতুন জায়গায় মন বসাতে বড্ড কষ্ট হয়। ওরা তিনজন অন্য কলেজে। কদাচিৎ দেখা হয় ওদের সঙ্গে। আমার কেবলি স্কুল জীবনের কথা মনে হয়।

হঠাৎ শুনলাম পুতুলের বিয়ে। পাত্র ইসলামপুরের ব্যবসায়ী, বয়স একটু বেশি হলেও বেশ সচ্ছল। সময়ে অসময়ে পুতুলদের বেহাল সংসারের হাল ধরতে পারবে। তাই এই ব্যবস্থা।

মনটা খারাপ হয়ে রইলো কিছুদিন। এরপর যে যার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। কলেজ আর ইউনিভার্সিটির নতুন বান্ধবীদের ভিড়ে হারিয়ে গেল পুরনো মুখগুলো।

কেবল নীরার সঙ্গেই ক্ষীণ একটা যোগসূত্র রয়ে গেল। বহুদিন পরে নীরার কাছেই শুনলাম রুবি আর সেলিমভাইয়ের অসুখী দাম্পত্য জীবনের কথা। রুবি নাকি প্রায়ই মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে। এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সেলিমভাই ব্যবসার খাতিরে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান, সঙ্গে থাকে নিত্যনতুন সঙ্গিনী।

আর পুতুল? বছরের এমাথা ওমাথায় পাচ পাচটি বাচ্চার জন্ম দিয়ে সংসার সামলাতে সামলাতে বুড়িয়ে গেছে অকালেই। আহা! কতো প্রতিভাই না ছিল ওর মধ্যে।

আরো শুনলাম, ও নাকি পুরনো বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হলে না চেনার ভান করে।

তা তো ও করতেই পারে। বান্ধবীদের পাল্লায় পড়েই তো ওর জীবনটা অন্য রকম হয়ে গেল। এতোটা বছর পার করে দিয়ে আজ সেই সব দিনের কথা ভাবলে বুঝতে পারি সেদিন অপরিণত বুদ্ধির কয়জন কিশোরী কি ভয়ঙ্কর খেলাটাই না খেলেছিলাম!

খিলগাও, ঢাকা থেকে

বহুমাত্রিক

– ওমর খৈয়াম

পৃথিবীর প্রায় সব লেখনির পেছনেই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে *ভালোবাসা* নামের বস্তুটি। মানব প্রেম, দেশপ্রেম, এমনকি প্রকৃতির সৃষ্ট পাহাড়, পবর্ত, নদী, সাগর, জীবজন্তু, বৃক্ষরাজি নিয়েও যে লেখনি এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সব কিছুর পেছনেই ভালোবাসা নামের বস্তুটিই মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। যার হৃদয়ে ভালোবাসা নামের বস্তুটি অনুপস্থিত সেই লোকটি অস্বাভাবিক। কারো মানুষের প্রতি, কারো দেশের প্রতি, কারো বা জীবজন্তুর প্রতি, পাষণ্ড স্বামী কিংবা স্ত্রী বলতে আমরা যা বোঝাই সে পাষণ্ডদেরও ভালোবাসা আছে হয়তো অন্য কারো প্রতি।

তবে সময় ও অবস্থান ভেদে সেই ভালোবাসা পরিবর্তিত হয়। যেমন শিশুকাল থেকে কৈশোরকাল। এ সময়টাতে পৃথিবীর সব কিছুই ভালো লাগে। সব কিছুর প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। একদিন ধীরে ধীরে জীবনের ব্যস্ততা, দায়িত্ব বোধ জীবনকে ঘিরে ধরে। তখন শৈশবের ভালোবাসার বস্তুগুলো হারিয়ে যায়। আবার একটি বয়সে নিজের সন্তান অথবা নাতি–নাতনিদের সঙ্গে শিশুকালের সেই খেলাগুলো, হাসি–তামাশাগুলো করতে ভালো লাগে। অবশ্যই নির্ভর করে খোশ মেজাজের ওপর।

মানুষের ভালো লাগার কতোগুলো বিচিত্র দিক আছে। কৈশোরকালে যখন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে মানুষ যৌবনের বিভিন্ন দিকগুলো অনুভব করে তখন সহপাঠী ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। সেই বন্ধুত্ব করতে যাওয়ার আগ্রহ থেকে জন্মায় ভালোবাসা, এমনকি একদিনের জন্য একে অপরকে না দেখলে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বিপরীত লিঙ্গের ভালোবাসার স্বপ্ন দেখায়। বিয়ে করার, সুখের সংসার করার। তবে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা যদি কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত হয় অথবা সামাজিক রীতি–নীতির জন্যে বাধা হয়ে দাড়ায় তাহলে ওই মানুষগুলোর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সমলিঙ্গের মানুষের সঙ্গেই এবং সেখান থেকেই জন্ম নেয় সমকামিতা।

আমাদের দেশে সমকামীরা এক পর্যায়ে বিয়ে করে তাদের সমকামিতার অভ্যাস ছড়ে। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে বা যে দেশে সমকামীরা সামাজিকভাবে নিগৃহীত হয় না সেই দেশগুলোতে সমকামীরা লিভ টুগেদার করে, এমনকি বিয়ে করে। এই সমকামীরা পরস্পরকে *হানি, ডারলিং* বলে সম্বোধন করে। একেবারে স্বামী–স্ত্রীর মতোই তাদের চালচলন।

নারী–পুরুষ জুটি অথবা সমকামী জুটিদের মধ্যে এক পর্যায়ে যে ব্যাকুল ভালোবাসা উদ্বেলিত হয় সেটা কয়েক মাস বা কয়েক বছর দীর্ঘায়িত হয়। তারপর এই জুটি টিকে থাকে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতার ওপরও যৌন ক্ষুধা নিবারণ, সন্তানের জন্মদান, সংসারের খরচাদি বহন ইত্যাদিতে। তবে এই জুটির মধ্যে সেই বেশি লাভবান হয় বা সুফল ভোগ করে যে বেশি চালাক। চালাক লোকদের তেমন সামর্থ বা যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন পুরুষের বেলায় অর্থ–সম্পত্তি প্রধান এবং নারীদের বেলায় তার রূপ–যৌবন অথবা উভয়ের বেলায় নৈতিকতার ওপর চরম অবস্থান। কিন্তু এটাকে ভালোবাসার জুটি বলা যায় না। ভালোবাসা তাদের এই

জুটি বাধার পেছনে প্রথম অবস্থায় কাজ করেছে মাত্র। এখন একজন আরেকজনকে ডমিনেট করছে। আরেকজন ডমিনেটকারীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে জুটি ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ, যখন তারা দেখতে পায় তার সঙ্গী তাকে বেশি করে ডমিনেট করছে অথবা যৌনকর্মে নড়বড়ে তখন তারা এক মুহূর্তও দেরি করে না। ভালোবাসার কোনো মন্ত্রই তাদেরকে ফেরাতে পারে না।

তবুও মানুষ ভালোবাসা খুজে বেড়ায়। কাউকে ভালোবাসতে চায়। সেই বাসনা থেকেই হয়তো দেখা যায়, ধনী দেশগুলোর মানুষেরা গরিব ঘরের সন্তানদের দত্তক নেয় অথবা কেউ জীবজন্তু পোষে। তাদের পোষ্য কুকুরকে তারা শিশুর মতোই ভালোবাসে, সুন্দর নাম রাখে। তার সঙ্গে একটু-আধটু কথা বলে এবং আদর করে চুমু খায়। কুকুরের মালিকের পরিচিত কেউ যদি তার পোষ্য কুকুরটিকে আদর না করে তাহলে পরিচিতজনকে ভালো চোখে দেখে না কুকুরের মালিক। এমনকি পোষ্য কুকুর মারা গেলে তাদের চোখ দিয়ে টল টল করে পানি গড়িয়েও পড়ে।

ভালোবাসা সৃষ্টিকর্তার সুন্দরতম এক সৃষ্টি। ভালোবাসা কি? এটাকে খুজতে যাওয়া নিরর্থক প্রচেষ্টা। তবে ভালোবেসে যাও, তা না হলে অস্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই শিক্ষাটি ভালোবাসা বার বার শেখায়।

খিলজি রোড
magnumsq@hotmail.com

তুমি

জুয়েল,

তোমাকে ভালোবাসি কি না তা জানি না। শুধু জানি, তোমাকে আমার খুব মনে পড়ে। শয়নে-স্বপনে এবং যখন-তখন। তোমার সঙ্গে শুধু কথা বলতে ইচ্ছা করে। কারো সঙ্গে কথা বলে শান্তি পাই না। মনে হয়, কোথায় যেন ফাক রয়ে গেছে। কিন্তু তোমার ছোয়া বা নাগাল পাই না এবং আর পাবোও না।

সেই ছোটবেলায় তুমি আমাকে যে রেখা একে দিয়েছিলে তাতে তখন যেটুকু ভুলেছিলাম এখন যেন সেটা মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে। তোমার দোষ দেবো না। সবই আমার নিয়তি। যখন বুঝতে পারলাম আমার যেন কাকে ভালোলাগে, মনটা চায় তার সঙ্গে কথা বলতে ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম, তুমি অন্যজনকে ভালোবাসো, তাকে বিয়ে করবে। এতো কিছু জানার পরও সেই একই আশা মনের ভেতর নাড়া দিচ্ছিল। মনে হয় যদি তোমার সঙ্গে পত্র মিতালি করতে পারতাম আসল পরিচয় না দিয়ে!

সব কিছু ঠিকও করেছিলাম। কিন্তু ঠিকানা না পাওয়াতে তা আর হলো না। নাম না বলে একটু টেলিফোনে কিংবা মোবাইলে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তবুও পারলাম না। শুধু মনে হতো কি দরকার, সে তো আরেকজনকে...।

তখন সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিই। একটু ঘুমানোর চেষ্টা করি। পড়াশানায় ঠিকমতো মন বসাতে পারিনি। তোমার কথা ঝরে পরেছে আমার লেখার খাতায় কিংবা ডায়রিতে। তবুও স্বস্তি পাইনি, পাইনি একটু আনন্দ। তাই ঠিক করলাম একটু লিখেই ফেলি। এ জন্য লিখলাম, একটু কথা বলতে চাই, বন্ধুত্ব করতে চাই। কারণ, প্রেম করার আশা তো নেই, পথও নেই।

তবু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করলে। আমি জানি না, এর নাম ভালোবাসা কি না। আমি এ কথা কাউকে বলতে পারি না। কারণ, তুমি আমার আত্মীয়। তাই তো নিজের ওপর জোর দিয়ে কথাগুলো চেপে রেখে আসছি।

জানো, নিজেকে তখন খুবই অসহায় লাগে যখন মনে হয়, তোমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হলাম একটু বন্ধু হওয়ার জন্য। তাই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। জানি, তুমি এই লেখাটা পড়তে পারবে না। কারণ,

এটা তুমি পড়ো না। তবু আমি আমার প্রিয় যায়যায়দিনকে সবচেয়ে গোপন কথাটি বললাম। আমি আর কাউকে এ কথা বলিনি। যদি আমার লেখাটি তোমার চোখে পড়ে তো আমাকে ক্ষমা করে দেবে।

জানি না, পাঠক–পাঠিকারা কি মনে করছেন। হয়তো বোঝাতে পারলাম না আমার মনের কথা। তবুও যেটুকু বুঝেছেন, বলবেন এর নাম কি ভালোবাসা, না অন্য কিছু? সত্যি বলতে কি, একটু শান্তি চাই। পড়াশোনা করে মানুষ হতে চাই। ওই সব ভালোবাসা–টাসা আমি চাই না। কিন্তু এ কোন সমস্যায় পড়লাম বলেন তো? সত্যি তাকে ভুলে যেতে চাই। তার সঙ্গে কথাও বলতে চাই না। কেননা এর মাঝে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা।

যায়যায়দিনকে লিখলাম যদি একটু মনটা হালকা হয়। হাজার হাজার পাঠক পড়বেন, না–ইবা পড়লো সে। তবুও এতোটুকু দুঃখ পাবো না যদি আমি হালকা হই। জানি, আমার লেখা পূর্ণতা পাচ্ছে না।

সবশেষে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে শেষ করছি। আর তুমি বলার জন্য লজ্জিত।

ইতি – জুই

ঠিকানা বিহীন

লাজুক প্রেমিক

– এ্যানি

সে ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী সেতুর ফুপাতো ভাই। তাকে প্রথম দেখেছিলাম ঈশিতার বাসায়। সে এসেছিল সেতুর সঙ্গেই। আমরা এক ঝাক মেয়ে বান্ধবীর মাঝে সেই ছিল মাত্র একজন পুরুষ। তাই হয়তো লজ্জায় মাথাটা সোজা করতে পারছিল না। তাকে স্বাভাবিক করার জন্য বলেছিলাম, এতো লজ্জা কিসের?

আমার কথা শুনে দেখি মাথাটা আরো নিচু হয়ে যায়।

লাজুক পুরুষদের একদমই পছন্দ করি না। তাই বলেই ফেললাম, যেভাবে মেয়েদের দেখে লজ্জা পাচ্ছেন তাতে ভবিষ্যতে বিয়ে করতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে।

পরের দিন দেখি সে চিরকুট পাঠিয়েছে।

যদি আমার লজ্জা দূর করতে সাহায্য করেন তাহলে আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো। প্লিজ, না করবেন না।

তাকে সাহায্যের হাত বাড়াতে গিয়েই অনুভব করলাম, তাকে মনের গভীরে স্থান দিয়ে ফেলেছি। মানে তাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

কদলপুর, চট্টগ্রাম থেকে

মানুষ মানুষের জন্য

– খালেদা পারভীন সুলতানা

আমাদের চার পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ ভালোবাসা। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাচে কিভাবে? ভালোবাসাই তো মানুষের বেচে থাকার উৎস।

এই আমার কথা বলি। ব্যক্তি জীবনে আমি একজনের স্ত্রী। দুটো বাচ্চার মা। বাবা–মায়ের একমাত্র মেয়ে, এক বৃদ্ধা মহিলার একমাত্র পুত্রবধূ। এদের ভালোবাসা আমাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখে। আমি অসুস্থ হলে স্বামীর উৎকণ্ঠা। এতো ভালোবাসাই। আবার কোথাও বের হলে ফিরতে যদি দেরি হয় তাহলে শাশুড়ির উৎকণ্ঠা। সেও তো ভালোবাসাই।

আমার বাচ্চারা আমার মুখটা একটু মলিন দেখলেই অস্থির হয়ে ওঠে, মায়ের কেন মন খারাপ? শরীর অসুস্থ কি না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, দুটো অবুঝ মনের এ যে অস্থিরতা এটা কি ভালোবাসা নয়? পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গে কি এর তুলনা চলে?

দরজা খুললেই যে প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়, কুশল বিনিময় হয়, সময়ে-অসময়ে আড্ডা জমে, দিনে দিনে সম্পর্কটা এতো গভীর হয় যেন আত্মীয়র চেয়েও বেশি। সেই প্রতিবেশীর হঠাৎ বাসা বদল করে চলে যাওয়ায় মনটা এতো বেদনায় ভারাক্রান্ত হয় যেন কোনো আপনজনের বিয়োগ ব্যথা। এটা কি ভালোবাসা নয়?

এরই নাম ভালোবাসা, মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা।

এমনই মুঠো মুঠো ভালোবাসা আমাদের চার পাশে ঘিরে আছে। তাই তো বেচে থাকা এতো সুন্দর। এতো ভালোবাসা ফেলে কার মরতে ইচ্ছা করে? আমার তো নয়ই! ইচ্ছা হয় হাজার বছর বেচে থাকি স্বামীর সোহাগিনী স্ত্রী হয়ে, মমতাময়ী মা হয়ে, বাবা-মায়ের আদরিনী কন্যা হয়ে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

নিয়তি এমনই নিষ্ঠুর যে, এতো সব ভালোবাসা ফেলেও মানুষকে একদিন চলে যেতে হয় দূর অজানার দেশে। সেদিন কোনো ভালোবাসাই তাকে আটকে রাখতে পারে না। ভালোবাসার শক্তি যদিও বা অসীম তবে মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবের কাছে ভালোবাসা কেবলই হেরে যায় চিরকাল।

মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালি থেকে

ইউরেকা

– শাহেদ

আসলেই প্রেম স্বর্গীয়। তা না হলে কেন এতো পিছুটান আমার ছোট্টবেলার সেই খেলার সঙ্গী ইউরেকা-র প্রতি?

প্রথমেই বলি ইউরেকা কে? সে আমার খালাতো বোন যাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন, আমার আশা। সে আমার ভালোবাসা।

যখন বয়স দশ বারো তখন হয়তো বুঝতাম না প্রেম কি, ভালোবাসা কি? তবুও তার সঙ্গে মেলামেশা ছিল খুব। আমাদের বাড়ি আর তাদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি।

পড়ালেখাটাও হতো এক রুমে। তাই আমাদের সুযোগ ছিল বেশি। দুজন পাশাপাশি চেয়ারে বসতাম পড়ার টেবিলে। কিন্তু পড়ালেখা হতো না। কেননা সে চেয়ার থেকে উঠে আমাকে বলতো, চল ওটা করি।

আমিও উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতাম।

এভাবে প্রায় প্রতিদিনই চলতো। চলতে চলতে আমি এসএসসি পাস করি। ভালো রেজাল্টও করি। কিন্তু তার মধ্যে আগের সেই সাড়া আর পাচ্ছিলাম না।

পাস করার পর ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়ে যাই শহরের প্রতিষ্ঠিত কলেজে। চলতে থাকে পড়ালেখা। মাঝে মধ্যে বাড়ি যেতাম। তার সঙ্গে দেখা হতো, কথা হতো আর দুষ্টুমি হতো। কিন্তু তা আগের মতো নয়।

এভাবে দেখতে দেখতে আমার এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়। রেজাল্ট হতে আরো দুই তিন মাস। দীর্ঘ সময়। সে সুযোগে বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে শুরু হলো আমাদের সেই আগের প্রেম ভালোবাসা।

মামা আমাদের একটাই। মামার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে মিনার ক্লাস ফাইভে আর মেয়ে দিনার ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। মামার ইচ্ছা তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো করুক। আমিও বেকার বসে আছি। ইউরেকার এসএসসি রেজাল্ট হয়েছে। কলেজে ভর্তি হয়নি। সেও বসে আছে। তাই মামার ইচ্ছা। ছেলে মিনারকে আমি এবং মেয়ে দিনারকে ইউরেকা পড়াবে।

আদেশ অনুযায়ী দুজন দুজনকে পড়াতে শুরু করলাম। পড়াতে বসতাম। আমি কথা বলে ইউরেকাকে বোকা বানিয়ে দিতাম।

এভাবে বিশ পচিশ দিন পড়ালাম। আমরা পরস্পরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম।

এক রাতে টেলিভিশন দেখতে বসলাম দুজনে। এক সময় আমাকে ইউরেকা জিজ্ঞাসা করলো, তুই আমার কে?

বললাম, কেন? খালাতো ভাই।

সে বললো, শুধুই খালাতো ভাই? আর কিছুই নয়?

সত্যি করে বলবো?

বল।

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের যতোদূর কাছের মানুষ হতে পারে তুমি আমার সেই মানুষটি।

এ কথা শোনার পর সে চুপ করে বোবার মতো আমার দিকে থাকিয়ে থাকলো।

বললাম, এবার তুমি বলো আমি তোমার কে?

সে বললো, তুমি আমার ভালোবাসা।

শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম, তুমি এতোদিন আমাকে বলোনি কেন?

ভয়ে।

কিসের ভয়?

তোমাকে হারানোর ভয়। যদি তুমি আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করো সেই ভয়।

এভাবে আমাদের সম্পর্ক অনেক দূর গড়িয়ে গেল।

আস্তে আস্তে আমার এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট সামনে চলে এলো। রেজাল্ট বের হলো। রেজাল্ট ভালো করি। আবার ফিরে যেতে হবে নিজের প্রয়োজনে শহরে।

আসার আগের দিন তাকে বললাম, আমি কাল চলে যাবো। এ দুই তিন মাসে আমরা যা পেয়েছি তা পাওয়ার সুযোগ জীবনে আর আসবে না।

সে বললো, কেন?

তা বলতে পারছি না।

রাতে দুজনে এক সঙ্গে বসেছি, টেলিভিশন দেখছি। শুধু দুজন। আর কেউ নেই।

রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে।

তাকে বললাম, তোমার হাতে আমার হাতটা কি রাখতে পারি?

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

তার হাতে হাত রাখলাম। হাত রেখে আমার মনে হলো পৃথিবীর সব সুখ যেন আমার কাছে চলে আসছে।

অনেকক্ষণ পর সে বললো, আমাদের দুজনের হাত কি সারা জীবন এভাবে থাকবে?

বললাম, থাকবে না কেন?

আমাদের দুজনের পরিবার কোনোদিন মেনে নেবে না।

পরিবারের কথা বাদ দাও, তুমি কি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবে?

বললো, কি সিদ্ধান্ত?

যে সিদ্ধান্তই হোক, তুমি অটল থাকবে কি না বলো।

সে বললো, থাকবে।

তাহলে তুমি আল্লাহতাআয়ালাকে সাক্ষী করে বলো, তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ভাববে না। অন্য কাউকে বিয়ে করবে না আর আমার সিদ্ধান্তে সব সময় অটল থাকবে।

তা মেনে নিয়ে আল্লাহকে সাক্ষী করে কসম করলো।

এরপর শুরু হলো আমাদের মধ্যে চাওয়া পাওয়ার পালা। আমি তার কাছে প্রথমে একটি চুমু চাইলাম।

সে চুপ থাকলো।

তার নীরবতার অর্থ বুঝতে পেরে তার টানা টানা ঠোট ও মুখে চুমু দিলাম। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

সেও আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।

এরপর আমি আর আমার কান্নাকে ধরে রাখতে পারিনি। বেরিয়ে এলো আমার জমানো দুই চোখের জল।

আমার কান্না দেখে সেও তার কান্নাকে ধরে রাখতে পারলো না। আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

চান্দগাও, চট্টগ্রাম থেকে

জাদু

বাবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করতেন। সেই কারণে বাড়িতে তিনি খুব কম সময় থাকতেন। তাছাড়া আবার আমার মাও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সেই সুবাদে আমাকে আমার ছোট ফুপির বাড়িতে থাকতে হয়েছে। এখন আমি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। কৈশোর না পার হলেও পার হওয়া হওয়া অবস্থা। তাই নিজের ভালো–মন্দ সম্পর্কে যথেষ্ট বুঝতে শিখেছি।

যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন আমার ফুপাতো ভাই ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেন। ভাইয়া ছিলেন খুব সুন্দর। হ্যান্ডসাম ও সংগঠনপ্রিয় লোক। স্বাভাবিক কারণেই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। ভাইয়াকে আমি কিছুটা ভয় পেতাম বলে তার সঙ্গে কম কথা বলতাম।

এভাবেই চলে গেল অনেক বছর। কিন্তু যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন ভাইয়া আমার সঙ্গে অন্য রকম ব্যবহার করতে শুরু করলেন যা আমার খুব অদ্ভুত মনে হতো। বাড়ির সবাই যখন কোনো অনুষ্ঠানে যেতো তখন আমাকেও নিয়ে যেতো। মাঝে মধ্যে আমাকে কোনো কারণে রেখে গেলে ভাইয়া সেই সুযোগে শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ছুয়ে দিতেন।

বিষয়টা আমার মোটেও ভালো লাগতো না। নিজের বয়স কম হওয়াই এবং ভাইয়াকে খুব আপন মনে হওয়াই বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিতে নিতে পারতাম না। ভাইয়ার ওপর ছিল সবার অন্ধ বিশ্বাস। তাছাড়া অবিশ্বাস করার কোনো কারণও তো নেই। আমি ছিলাম তার ছোট বোনের মতো। আমি তার মামাতো বোন। তাছাড়া সে যে আমাকে অন্য চোখে দেখে বা দেখতে পারে এটা সবার ধারণার বাইরে।

হঠাৎ একবার বাসায় কাজের মেয়ে নেই। ফুপা–ফুপু যেহেতু চাকরি করেন সেহেতু অফিসে যেতেই হবে। আপু ও ভাইয়াকে কলেজ করতে হবে। আমি ছাত্রী হিসেবে ভালো না। তাই যে কদিন কাজের মেয়ে থাকবে না সে কয়দিন আমাকে বাড়ি থাকতে হবে।

প্রথম দিন আপু কলেজে গেলেন, ভাইয়া কিসের জন্য যেন গেলো না। আপু যাবার পর ভাইয়া আবার সেই অদ্ভুত ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

আমার শারীরিক অবস্থা ভালো থাকায় ইতিমধ্যে দৈহিক কিছু পরিবর্তন এসেছিল। পরের দিন ভাইয়া আবার আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ স্থানে তার বিশেষ অঙ্গ ছুয়ে দিলেন।

জানি না আমাকে তিনি কি জাদু করেছিলেন। কোন শক্তি দিয়ে তিনি আমাকে এমন বোকা করেছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে দুটো ছবি দেখিয়েছিলেন। ছবি দুটো ছিল প্রায় বস্ত্র শূন্য দুটি মেয়ের।

আমি এইট পর্যন্ত ওখানে ছিলাম। যখন এই সম্পর্কে বুঝতে পারলাম তখন ওখান থেকে চলে আসার জন্য সবার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত আমার মনের আশা পূরণ হলো।

বাবার সঙ্গে গ্রামে চলে এলাম। গ্রাম থেকে এসএসসি পাস করে বড় ফুপির বাড়ি এসেছি এবং কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমার পড়ালেখার খরচ ছোট ফুপিই দেন। টাকা আনতে গেলে মাঝে মধ্যে ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু কথা বলেন না। শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকি। যখন ওই সব কথা মনে হয় তখন এক অদ্ভুত নষ্টালজিয়া পেয়ে বসে।

তাকে আমার ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু ঘৃণা করতে পারি না। কেননা তাকে দেখার জন্য আমার মনটা যে সব সময় কাদে। আমি যে তাকে হৃদয়ের মন্দিরে ঠাকুরের আসনে বসিয়েছি। আমি যে তাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তাকে এতো বেশি ভালোবাসি, পৃথিবীর যে কোনো কিছুর বিনিময়ে তাকে সুখী দেখতে চাই।

তার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, মি. ভাই, আমার সঙ্গে আপনি যে ব্যবহার করেছেন তা সবাই জানতে পারলে আপনার মাথা নত হয়ে যেতো। আর এতে আপনি খুব কষ্ট পেতেন। কিন্তু আপনার কষ্টে আমার চোখে জল আসে এবং বুকের এক ধারে বিরাট একটা গহ্বর অনুভব করি। তাই সবাই জানার আগেই ওখান থেকে চলে এসেছি যাতে আপনাকে অপমানিত না হতে হয়।

আপনাকে ভালোবাসি, ভালোবাসতাম, ভালোবেসে যাবো সারা জীবন। যদি কখনো আমার জন্য একটু ভালোবাসা অনুভব করেন তাহলে দয়া করে জানাবেন । আমার দরজা আপনার জন্য চিরদিন খোলা থাকবে। আপনার অপেক্ষায়ই রইলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আক্কেলপুর, জয়পুরহাট থেকে

আদর

– মধুপুত্র আউয়াল

অনেককাল আগের কথা। কতোই বা বয়স আমার? দুই তিন বছর হবে। ছোট বোন জন্ম নেয়ার সুবাদে অরিজিনাল পোর্ট (মায়ের কোল) থেকে বিচ্যুত হয়ে অক্সিলারি পোর্টে (বড় আপার কোল) শিফটেড হয়েছি। এসো এসো, কোলে এসো টাইপের কিউট চেহারার ছোট ভাইয়ের ফুল অথরিটি পেয়ে আমার বোনের অবস্থা হলো দুর্নীতি পরায়ণ কাস্টমস অফিসারের জিয়া এয়ারপোর্টে বদলি হওয়ার মতো। আমি কার কোলে যাবো তা নির্ভরশীল ছিল পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কে কাকে কতো বেশি ঘুস দিতে পারে তার ওপর। ঘুসের আইটেম ডাসা পেয়ারা, আচার, কাসন্দি মেশানো কাচা আমের ভর্তা, কুল বড়ই ইত্যাদি।

খুব সহজ লভ্য এবং সহজে প্রদানযোগ্য না হলেও আমাকে বাণিজ্য করে আমার বড় আপার দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল। আমারও জীবন কাটছিল পাড়ার সুন্দরীদের কোলে কোলে বাড়াবাড়ি রকমের আদর সোহাগে। অবশ্য এ রকম একটা ভাই না থাকার কারণে কেউ কেউ ঈর্ষান্বিতও ছিলেন বড় আপার ওপর। বিশেষত দুলু আপা। যার কোনো ভাইবোন ছিল না এবং আমার বড় ভাইয়ার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছিল তার সঙ্গে বড় আপার ছিল অহি–নকুল সম্পর্ক। বড় আপা সাধারণত দুলুআপাকে অনুমতি দিতেন না আমাকে কোলে নেয়ার।

একদিন শীতের বিকেলে বড় আপা আর তার বান্ধবীরা খেলছিলেন *বৌছি* খেলা। আমি খুব চেচামেচি করে কোল থেকে নেমে একটু খেলাধুলার সুযোগ পেয়ে সেটাকে কাজে লাগাচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে খেলতে খেলতে পাশের ডোবায় ধপাস করে পড়লাম।

শীতকাল। তাই পানি ছিল খুব কম। বেশি থাকলে তো আর এ গল্প লেখাই লাগতো না। তবে ডোবা ভর্তি ছিল ভীষণ আঠালো আর প্যাচপ্যাচে কাদা। কাদায় দুই তিন ডিগবাজি খেয়ে কিম্ভূত চেহারা নিয়ে উঠে দাড়িয়ে ভ্যা করে কেদে দিতেই দৌড়ে সবাই এলো আমাকে উদ্ধার করতে। তারা আমার চেহারা দেখে উদ্ধার করবে কি, সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

দুঃখ, অপমান আর রাগে আমার বোন বাজপাখি যেভাবে ছো মেরে মুরগির বাচ্চা নিয়ে যায় সেভাবে উড়িয়ে আমাকে বাসায় নিয়ে এলেন। তারপর গরম পানি দামি সাবান দিয়ে আমার কাপড় কাচার মতো করে কেচে, সাফ–সুতরো করে, সেরা পোশাকটি পড়িয়ে, চুল আচড়িয়ে কপালে টিপটি দিয়ে, চেহারাটা পরিপাটি করে ক্ষীরের চাক্কা বানিয়ে আবার নিয়ে এলেন বান্ধবী মহলে।

ব্যস, হই চই পড়লো আমাকে কোলে নেয়ার। কিন্তু আপার এবার প্রতিশোধ নেয়ার পালা। যারা হাসেনি কিংবা কম হেসেছে তারাই শুধু সুযোগ পেল।

এক পর্যায়ে দুলুআপাও চাইলেন আমাকে একটু কোলে নিতে।

কোনো চান্স নেই। আপার সাফ জবাব।

রেগে গেলেন দুলুআপা। আরে, কয়েকদিন পরই তো তোর ভাবী হয়ে তোদের ঘরে ঢুকবো। তখন তুই কি করে তার কাছে ঘেষিস সেটাই দেখবো আমি!

উত্তপ্ত জবাব তার। তার আগে তোকে আমি মেরে ফেলবো বলেই চিলের মতো চিৎকার দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন দুলুআপার ওপর বড় আপা।

যুদ্ধটা কতোক্ষণ চলেছিল সে বর্ণনায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলি, এর কয়েকদিন পর থেকে আমি দুই আপা...থুক্কু, বড় আপা আর বড় ভাবীর আদরেই বেড়ে উঠলাম।

চান্দইর, মানিকগঞ্জ থেকে

শেষ চিঠি

– হাসান ইমাম প্রিন্স

আজ তোমার দেয়া চিঠিগুলো সব খুলে পড়ছিলাম। খুব ভালো লাগছিল। মনের মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব এসে গেছে। তার সঙ্গে তোমার কাছে আমার লেখা চিঠিগুলো পড়লাম। হেভি মজা লাগলো। কি প্রচণ্ড সুন্দর একটা সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার, বিশ্বাস করো! আমার নিজেরই ভাবতে ভালো লাগছে যে আমি এতো সুন্দর একটা সম্পর্কের একটা অংশ।

তোমার বারণ সত্ত্বেও তোমার ওই চিঠিটা পড়ে আমার খুব হাসি পেল যেটাতে তুমি তোমার বোটানিকাল গার্ডেনে পড়ে যাবার কথাটা লিখেছিলে। প্লিজ রাগ করো না, তোমার লেখার ধরনটা এতো মজার ছিল যে না হেসে পারলাম না।

না, তোমার অনুরোধ বা দাবি সত্ত্বেও সিগারেট ছাড়তে পারলাম না। কারণ, আমি খুব একটা ভালো ছেলে না। ধরে নাও, এটা আমার নিজের প্রতি প্রতিশোধ। এবং নিঃসঙ্গতার এমন ভালো সঙ্গী আর কে হতে পারে বলো!

তোমার চিঠি সবগুলো একে একে পর পর পড়ে আমার কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তুমি আমাকে খুব খুব সামান্য হলেও ভালোবাসো বা ভালোবাসতে। হয়তো বা তা খুব সামান্য সময়ের জন্য। তা না হলে তুমি কখনোই বলতে না, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলে তা শুধু দুজনেরই কষ্ট বাড়াবে।
আমি যদি হৃদয়ের মতো নিজের পায়ে দাড়ানোর ক্ষমতা রাখতাম তাহলে হয়তো এ জটিলতার সৃষ্টি হতো না। তাই তুমি খুবই বুদ্ধিমতীর মতো নিজেকে সরিয়ে নিয়েছো। তাতে আমার কষ্টও কমেছে তোমার জটিলতাও মিটেছে। কিন্তু আমার মতো ক্ষুদ্র একটা প্রাণীর জন্য এ কথাটা জানাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাওনা যে এই সুন্দর পৃথিবীতে কেউ, কখনো কোনো সময়ে, কোনো মুহূর্তে একবারের জন্য ভুল করে হলেও ভালোবেসেছিল।

তুমিই তো বলেছিলে যে ভালোবাসা মানে স্পর্শ নয়, অনুভব। তাহলে কেন হারানোর ভয়ে পালিয়ে গেলে? তুমি বলেছিলে, কাউকে মন থেকে ভালোবেসে দেখো, পৃথিবীটা কতো সুন্দর হয়ে যায়।
হ্যা আমি আজ জীবনের প্রতি মুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করছি এই পৃথিবীর সব কিছু সুন্দর। কারণ, যাকে ভালোবেসেছি তাকে ছাড়তে পেরেছি শুধুই তার মঙ্গলের জন্য। তার ভালো থাকার কথা স্মরণে রেখে। আর পৃথিবীর সেই তাবৎ সুন্দরগুলো তার উদ্দেশ্যে অর্পণ করছি।
তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তাই তোমাকে হারানোর ভয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য তোমার বন্ধু হয়ে থাকতে চেয়েছি।
জানো, যেদিন রাতে তোমার সঙ্গে তোমার মোবাইলে প্রথম কথা হলো সেদিন জানতাম না তুমিই ওপাশে কথা বলছো। কিন্তু কিভাবে যেন আমার ভেতর থেকেই কে যেন বলে দিয়েছিল এ গলা তোমার না হয়ে যায় না। যখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, তুমিই তখন আমার দেহে যে শিহরণ জেগেছিল তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।
তুমি জানতে চেয়েছো, তোমার চিঠিগুলো পড়ে আমি ছিড়ে ফেলি কি না? আহ! জানো, এগুলো সব সময় আমার হাতব্যাগের মধ্যে থাকে। কোন ব্যাগটা, বুঝেছো তো? যে ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে ঢাকাতে দেখা করতে সেই কালো ব্যাগটা। ব্যাগটা কখনো নিচে রাখি না। গাড়ি বা জার্নিতে ওটা সব সময় আমার কোলে থাকে। আমার সঙ্গে কেউ থাকলে সে বলে ব্যাগটা নিচে বা বাংকারে রাখতে।
কিন্তু আমি পারি না। কারণ, ওই ব্যাগের মধ্যেই আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তিগুলো লুকিয়ে আছে। তোমার লেখা পচিশটা চিঠি, দুটো জন্মদিনের কার্ড আর সেই ব্যান্ডটা সব সময় আমার হাত ব্যাগেই থাকে।
আচ্ছা, কেমন লাগে প্রেম করতে? একবার জানাবে যখন ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়া যায়? যখন ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসার কথা শোনা যায়? যখন তার একটু মনোযোগ পাওয়া যায়? যখন ভালোবাসার মানুষের একটু স্পর্শ পাওয়া যায়? কেমন তার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, স্বাদ, কেমন সেই সব মুহূর্তগুলো? কেমন রঙিন সেই সব দিনগুলো? কেমন সেই সব রাতগুলো?
না থাক, জানানোর প্রয়োজন নেই। পাছে লোভে পড়ে আবার আমার মতো নিকৃষ্ট প্রাণীর সেই স্বাদ নিতে ইচ্ছা হয়। তার চেয়ে সেই ভালো একা আছি। একাকী থাকি। আর চিরদিন কামনা করি, তুমি সুখী হও। তুমি সুখী জানলেই আমি সুখী। কেননা আমি জানবো, আমার ভালোবাসা সুখী। তাই যেখানেই থাকো, যতোদূরে থাকো, চিরদিন সুখে থেকো এই কামনা করি...।

বিদায় বন্ধু, খুলনা থেকে